ফেরীঘাট

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক :
গোপাল দাস মজুমদার
৫২, বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রক :
সনাতন হাজরা
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা—৬

রা-স্বা

বন্ধুবর শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী

ইষ্টস্বার্থপ্রাণেষু
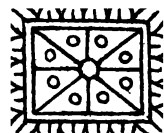
সিঁড়ির তলা থেকে স্কুটারটা টেনে নিয়ে রাস্তার পাশে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড় করাল মধু, তার হাতে পালকের ঝাড়ন। মুছবে। মুছলেও খুব একটা চকচকে হয় না আজকাল। রঙটা জ্বলে গেছে, এখানে ওখানে চটা উঠে গেছে। বেশ পুরনো হয়ে গেল স্কুটারটা।

জানালা দিয়ে নীচের রাস্তায় স্কুটারটা একটুক্ষণ অন্যমনে দেখল অমিয়। বহুকালের সঙ্গী। মায়া পড়ে গেছে। কল্যাণ তিনহাজার টাকা দর দিতে চেয়েছিল। জিনিসটা ইটালীয়ান বলে নয়, মায়া পড়ে গেছে বলেই বেচেনি অমিয়। তা ছাড়া একবার বেচে দিলে নতুন আর কেনা হবে না। অমিয়র দিন চলে গেছে।

মুখ ফিরিয়ে অমিয় টেবিলে সাজানো একপ্লেট টোস্ট, একটা আধসেদ্ধ ডিম, একগ্লাস দুধ, নুন-মরিচের কৌটো, চামচ—এসব আবার দেখে। সকাল আটটা কি সোয়া আটটা এখন। সাড়ে আটটায় সে রোজ বেরোয়। বেরোবার আগে সে রোজ টোস্ট ডিম নুন-মরিচ দিয়ে খায়। দুধ পান করে। বেরোয়। আজ কিন্তু খাবারগুলির দিকে তাকিয়ে দেখতেও তার অনিচ্ছা হচ্ছিল। খিদে নেই। বমি-বমি ভাব। রাতে ভাল ঘুম হয় নি, বার বার উঠে সিগারেট খেয়েছে। সকালে অনেকক্ষণ স্নান করেছে চৌবাচ্চা খালি করে। তবু শরীর ঠিকমত ঠাণ্ডা হয় নি। খাওয়ার কথা এখন ভাবাই যাচ্ছে না।

টেবিলের ওপাশে মুখোমুখি রোজকার মত হাসি বসে নেই। শোয়ার ঘরের দরজায় হাসি দাঁড়িয়ে আছে। কাল রাতে হাসিও বোধহয় ঘুমোয় নি। ঘুমোলে যে ছোট ছোট অবিরল শ্বাস পড়ে ওর, সেই শব্দ তো কৈ শোনে নি অমিয়। বেত আর বাঁশ দিয়ে তৈরী

ভারী সুন্দর একটা খাট শখ করে কিনেছিল হাসি, যখন অমিয়র সুদিন ছিল। পুরনো বড় খাটটা বেচে দিয়ে অমিয় কিনে নিল একটা সোফা-কাম-বেড। সেই থেকে দুজনের বিছানা আলাদা। বেতের খাটে হাসি, সোফা-কাম-বেডে অমিয়। সেইটাই কি মারাত্মক ভুল হয়েছিল?

বস্তুত তো ছোটবেলা থেকেই অমিয় যৌথ পরিবারে মানুষ। সেখানে বড় খাটের সঙ্গে আর একখানা বড়খাট জোড়া দেওয়া। বিশাল মাঠের মত বিছানা, শামিয়ানার মত বড় মশারি। দাদু ঠাকুমা শুতো, আর সেই সঙ্গে তারা রাজ্যের ছেলেপুলে। পরিবারের অর্ধেক এক বিছানায়। যারা সেই বিছানায় শুয়ে বড় হয়েছে তারা আজও কেউ একে অন্যের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয় নি, যে যার কাজে ধান্দায় আলাদা হয়ে ভিন্ন সংসার করেছে, দাদু ঠাকুমা মরে গেছে কবে। তবু সেই প্রকাণ্ড বিছানার স্মৃতি আজও অমিয়র পিসতুতো, মাসতুতো, জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো, ভাই আর বোনদের কাছ থেকে খুব দূরে সরাতে পারে নি। দেখা হলে সবাই অকৃত্রিম খুশী হয়, এক-আধবেলা জোর করে ধরে রাখে, প্রাণপণে খাওয়ায়, কত পুরনো দিনের গল্প হয়।

অমিয় খেতে পারছে না। একদম না। একটা টোস্ট মুখে তুলে দেখল। ভাল টোস্ট হয়েছে, মুড়মুড় করে ভেঙে যাচ্ছে দাঁতের চাপে। তবু অমিয়র কাছে কাঠের গুঁড়োর মত বিস্বাদ লাগে। ডিমটা থেকে আঁশটে গন্ধ আসে। দুধটাকে খড়িগোলা মনে হয়। অমিয় টোস্ট হাতে ধরে রেখে একবার চেষ্টা করে হাসির দিকে তাকায়। আসলে তাকাতে তার ভয় করছিল।

চোখে চোখ পড়ে। হাসির কোন দ্বিধা নেই, ভয় নেই। এমন নিষ্ঠুর মেয়ে অমিয় খুব কমই দেখেছে। অমিয়কে কখনো হাসি সমীহ করে নি। আজ পর্যন্ত বলতে গেলে হাসি সঠিক বৌ হয় নি অমিয়র। কারণ, ইচ্ছে হয় নি বলে হাসি সন্তান-ধারণ করল না আজ পর্যন্ত। না করে ভালই করেছে। তাহলে এখন অসুবিধে হত। হাসি তাই অমিয়র চোখে সোজা চোখ রাখতে পারে। ভয় পায় না। অমিয়র

কাছে তার কোন দায় নেই।

—আমি কিন্তু কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব। হাসি সকালে এই প্রথম কথা বলে।

অমিয় ভ্রূ তুলে বলে—কী বললে ?

হাসি বলে—আমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব। এখানে তো আমার নিজস্ব কিছু নেই।

—কী নেবে ?

—এই কয়েকটা শাড়ি ব্লাউজ, সাজগোজের জিনিস, একটা স্যুটকেস, কয়েকটা টাকা···

অমিয় শান্ত গলায় বলে—নিও। বলার দরকার ছিল না।

—বলেই নেওয়া ভাল। দরকারে নিয়ে যাচ্ছি। দরকার ফুরোলে ফিরিয়ে দেব।

শরীরের ভিতরটা বিড়বিড় করে অমিয়র। কিন্তু কিছু বলে না। বলা মানেই আবার অশান্তি। ছোট কথার ঢিল ছুঁড়ে হাসি দেখতে চায় মজা পুকুরটায় কী রকম ঢেউ ওঠে। মজা পুকুর ছাড়া অমিয় নিজেকে আর কিছু ভাবতে পারে না।

হাসি আবার বলে—এ সংসারে আমি তো কিছু নিয়ে আসি নি, কাজেই নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

অমিয় উঠল। টেবিলে তার টোস্ট ডিম আর দুধের ওপর মাছি উড়তে লাগল, বসতে লাগল।

স্কুটারটা রোদে দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় জানালা দিয়ে একবার দেখে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নেয়। দরজার ওপর একটা ছবি টাঙানো আছে। ছবির চারধারে একটা মালা করে টাঙানো হয়েছিল, মালাটা গত বছরখানেক ধরে শুকিয়ে এখন রুদ্রাক্ষের মালার মত দেখায়। ছবিতে ধুলো পড়েছে। বেরোবার সময়ে রোজই একবার ছবিটার দিকে অভ্যাসবশত তাকিয়ে বেরোয় সে। একবার হাতজোড় করার ভঙ্গী করে বেরিয়ে যায়।

—পুরো চাইছি না, কিছু দিন।

—কোত্থেকে দেব? পেমেণ্ট চারমাস আটকে আছে।

—কেন?

—সেনগুপ্ত চারটে এয়ারকণ্ডিশনিং মেশিন কিনেছিল, চারটে স্ক্র্যাপ। মেশিন আমার অর্ডারে খাইয়ে ঝগড়া করে ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল। তখনো জানতাম না যে স্ক্র্যাপ মেশিন খাইয়ে গেছে প্যাটারসনে। প্যাটারসন থেকে সেদিন চিঠি এসেছে, মেশিন স্ক্র্যাপ, পেমেণ্ট হবে না। সব বিল আটকে রেখেছে। সাত হাজার টাকার।

চুক-চুক করে জিভে একটা ক্ষোভের শব্দ করে মিশ্রিলাল।

—সেনগুপ্ত ডুবিয়ে গেল একেবারে!

অমিয় একটু হাসে। বলে—ডুবিয়ে যাবে কোথায়! ঠিক পেয়ে যাব।

অমিয় চুপ করে থাকে।

—বিলটার জন্য কবে আসব? আমার তো বেশী নয়, মোটে ন'শো টাকা। আমি গরীব মানুষ।

—মিশ্রি, বিলের আশা ছাড়। বরং আমাকে আরও কিছু ধার দাও। নগদ না দিলে মাল দাও। আমার হাতে তিনটে টেণ্ডার। দুটো লোয়েস্ট হয়েছে, আর একটাও পেয়ে যাব। এখন সেনগুপ্ত নেই, আমি একা। টাকা মার যাবে না।

মিশ্রি গলা চুলকোয়। বলে—তিনমাসে পেমেণ্ট পাচ্ছি না। কী যে বলেন। পুরনো লোক বলে ছাড়ছি না আপনাকে। কিন্তু কম্প্রেসারের পার্টসের জন্য লোকে ছিঁড়ে ফেলছে আমাকে। নগদ টাকার ছড়াছড়ি। এ-সব মাল এখন ক্রেডিটে দেয় কোন বুদ্ধু?

অমিয় জলটা একটু একটু করে খায়। স্বাদটা ভাল লাগে। তেষ্টা পেয়েছে খুব। গ্লাসটা আবার ঢেকে রেখেবলে—এবার কাটো তাহলে।

—সামনের সপ্তাহে আবার আসব।

—রোজ আসতে পার। কিন্তু লাভ নেই।

—বললেন যে আসতে। কিছু দেবেন। মোটে তো ন'শো টাকা।

ধৈর্যশীল মিশ্রিলাল ঝগড়া করে না। করলে করতে পারত। কিন্তু শান্ত মুখেই উঠে যায়। আবার ঠিক আসবে।

অমিয় নতুন টেণ্ডারের চিঠি দুটো টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে অন্য-মনস্ক ভাবে। ছেঁড়া টুকরোগুলো টেবিলের ওপর সাজায় তাসের মত। চেয়ে থাকে। সেনগুপ্ত কোথাও না কোথাও আছে ঠিক। কলকাতা হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়, তাতে ডুবসাঁতার কাটা যায়। কিন্তু একদিন না একদিন দেখা হবেই।

আজ-কালের মধ্যেই হাসি চলে যাবে। আজ বিকেলে বাসায় ফিরবার ইচ্ছে নেই অমিয়র। ফিরে খুব খারাপ লাগবে। হাসি যে কোথায় যাচ্ছে তা অমিয় জানে না। বোধহয় প্রথমে বাপের বাড়ি যাবে আসামে। তারপর বাগনানের কাছে এক গ্রামে, যেখানে ও চাকরি পেয়েছে, আগামী মাস থেকে চাকরি শুরু করবে। তারপর কী করবে হাসি? চাকরি করবে? তারপর? চাকরিই করবে। চাকরিই করে যাবে বরাবর। কিছু মনে পড়বে না। একা লাগবে না। খারাপ লাগবে না।

কল্যাণ টেবিলের ওপর পা তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে। তৃষ্ণা কোম্পানী দাঁড়িয়ে গেছে। দুজন কর্মচারী আউটডোরে ঘুরে বেড়ায়, কল্যাণকে কেবল অফিসটা দেখতে হয় আর ইনকাম-ট্যাক্স। কোম্পানী দাঁড়িয়ে গেলে আর তেমন ভাবনা নেই। রজতের টেবিল খালি। বড় একটা থাকে না রজত, প্রচণ্ড খাটে আর ঘোরে। দাঁড়িয়ে যাবে।

অমিয় নিঃশব্দে বসে থাকে কিছুক্ষণ। ভাবনা-চিন্তা করার মত মাথার অবস্থা নয়। মনে হয় বেশী ভাবতে গেলেই মাথায় সমুদ্রের মত বিশাল ঢেউ উঠে সে পাগল হয়ে যাবে।

বসে থাকলে এ রকম হবেই, অমিয় তাই উঠল।

কল্যাণ একবার তাকিয়ে বলল—কোন দিকে যাচ্ছেন?

—যাই একবার প্যাটারসনে। ওদের কাল মিটিং গেছে। লাহিড়ী বলছিল একটা ডিসিশন হবেই। যদি কিছু হয়ে থাকে দেখে আসি।

—মিশ্রিলাল কত পায়?

—ন'শো।

—গতকাল আমি একটা পেমেন্ট পেয়েছি। শ' চারেক দিতে পারি। মিশ্রিকে আপাততঃ কাটাবেন না, কিছু দিয়ে হাতে রাখুন।

—কেন?

—ফুড সাপ্লাইয়ের টেণ্ডারটা ধরে রাখুন। মিশ্রিকে কিছু খাওয়ালে ক্রেডিটে আবার মাল দেবে।

—আপনি তো ছশো অলরেডি পান।

—দেবেন এক সময়ে। পালাবেন কোথায়?

আবার চোখ বোজে। কল্যাণ ও রকমই। খুব মহৎ কাজও খুব অবহেলার সঙ্গে করে। অমিয় ঠিক কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারে না। মনটা সেরকম নেই। সেনগুপ্ত পালিয়েছে, হাসি চলে যাচ্ছে। ব্যবসা ঝুল।

নীচে এসে স্কুটারটা চালু করে সে। ভীড় কাটিয়ে ধীরগতিতে এগোয়।
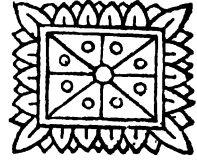
কাঁচের টেবিলে ছায়া পড়তেই লাহিড়ী মুখ তোলে।

—ভাল খবর মশাই।

—কী?

—আবার অর্ডার পাবেন। আপনার টেণ্ডার আমরা নেবো। কাল খুব লড়ালড়ি হল আপনার জন্য?

—কত টাকার অর্ডার?

—কম। হাজার পাঁচেক। কিন্তু ব্যাড বুকে আছেন এখন, এই অর্ডারই আপাততঃ পাঁচলাখের সমান। মেশিনগুলো যদি পাল্টাতে না পারেন তবে অন্ততঃ মেরামত করে দেবেন, বিল কিছু ছাঁট-কাট হবে। সাত হাজারের জায়গায় হাজার চারেক পেয়ে যাবেন। কিন্তু সেটা পাবেন মেশিন মেরামতের পর।

অমিয় ম্লান মুখে বসে থাকে। খবরটা ভালই। খুব ভাল। কিন্তু পাঁচ হাজারের অর্ডার ধরাও মুশকিল। পেমেণ্টটা আটকে রইল।

লাহিড়ী চা বলল। তারপর জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে, খারাপ দেখছি যে!

—কিছু না। শরীরটা ভাল নেই।

—বয়স কত?

—পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

লাহিড়ী গম্ভীর ভাবে বলে—ড্রিঙ্কস্?

—একটু আধটু।

—মেয়েছেলে?

—নীল।

—স্মোক ?

—দিনে চল্লিশ পঞ্চাশটা।

—চেক-আপ করান। হার্ট, ব্লাড, ইউরিন।

চা এসে যায়। দামী চায়ের গন্ধ। ভাল লাগে অমিয়র। আস্তে আস্তে চেখে চেখে খায়। প্যাটারসন ওগিলভি অ্যামালগামেশান পুরনো কোম্পানী। ব্রিটিশারদের হাত থেকে গত বছর কিনল এক পাঞ্জাবী। দশ বছর ধরে প্যাটারসনের সঙ্গে ব্যবসা করছে অমিয়। সকলের সঙ্গেই চেনা হয়ে গিয়েছিল, গুডউইল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেনগুপ্ত ডুবিয়ে দিয়ে গেল। পুরনো সাপ্লায়ার বলে প্যাটারসন অমিয়কে ছাড়াল না, কিন্তু নীচু নজরে দেখবে এখন, বেশি টাকার অর্ডার দিতে ভয় পাবে।

লাহিড়ীর খাঁই বেশি নয়। ওয়ান পার্সেণ্ট নেয় বিল থেকে। অন্য পারচেজ-অফিসারদের বায়নাক্কা অনেক। সেই তুলনায় লাহিড়ী দেবতা।

অমিয় উঠে বলল—অনেক ধন্যবাদ।

লাহিড়ী হাসল। বলল—সেনগুপ্তর খবর কী ?

—খবর নেই।

—ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—ও-সব মাল আমরা চিনি। আপনিই চিনতে পারেন নি।

অমিয় দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখে।

নীচে এসে আবার স্কুটার চালু করে অমিয়। কোথাও যাওয়ার নেই। সব জায়গায় পাওনাদার বসে আছে। হাজার দশ-বারো টাকার ক্রেডিট বাজারে। গোটা দুই বিলের পেমেণ্ট সামনের সপ্তাহে পাওয়া যাবে। তার আগে অমিয়র কোথাও যাওয়া হবে না। পেমেণ্ট পেলেই কিছু ধার শোধ হবে। হাতে কিছুই থাকবে না।

প্যাটারসন ওগিলভি অ্যামালগামেশন পিছনে ফেলে অমিয়র স্কুটার ধীরগতিতে, ভ্রমরের গুঞ্জন তুলে চলতে থাকে। উদ্দেশ্যহীন।

চললে বাতাস লাগে। থেমে থাকলে গুমোট। একটা পেট্রোল পাম্পে থামতেই গুমোটটা টের পায় সে। তিনটে গাড়ি তেল নিচ্ছে, কাজেই একটু অপেক্ষা করতে হয় তাকে। কাঁচা পেট্রোলের গন্ধে একটা মাদকতা আছে। গন্ধটা বরাবর ভাল লাগে তার। মন চনমন করে ওঠে। বুক ভরে সে পেট্রোলের গন্ধ নেয়। ঝিমোয়। কয়েক মুহূর্তেই শার্টের নীচে ঘাম কেঁচোর মত শরীর বেয়ে নামে। হাতের তেলো ভিজে যায়।

পিছনে একটা গাড়ি তীব্র হর্‌ন্ দেয়। অমিয় ঝাঁকুনি খেয়ে চোখ চায়। সামনের গাড়ি চলে গেছে। অমিয় এগোয়। ট্যাঙ্ক-ভর্তি তেল নেয়। আবার স্কুটার ছাড়ে। উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে থাকে।

মধ্য-কলকাতার অফিসপাড়ায় কত বাড়ি তৈরী হচ্ছে। দারুণ দারুণ বাড়ি, লাখ লাখ টাকা খরচ। ভিতরে কোটি কোটি টাকার লেন-দেন।

অফিস, কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, জীবনবীমার বাড়ির ছায়ায় ছায়ায় অমিয় তার স্কুটার চালায়। শরীরের ঘাম মরে আসে। হাসি কিছু টাকা চেয়েছে। কত টাকা তা বলেনি। স্টীলের আলমারীতে শ' তিনেক আছে মনে হয়। অমিয়র পকেটে বড়জোর শত খানেক। হাসি জানে, অমিয় এখন দড়ির ওপর হাঁটছে, তাই বেশি নেবে না বোধহয়। হাসি টাকা চায় না। মুক্তি চায়। কিন্তু ওকে এ সময়ে কিছু টাকা দিতে পারলে অমিয় খুশি হত।

সোনাদা যে ব্যাঙ্কে চাকরি করে সেই ব্যাঙ্কটা পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থামে অমিয়। বছর তিনেক আগেই সোনাদা অ্যাকাউন্ট্‌স্ অফিসার ছিল। এখন কি আর একটু ওপরে উঠেছে! সাহেবী ব্যাঙ্ক, একগাদা টাকা মাইনে পায় সোনাদা। কপালটা বড় হয়ে হয়ে অনেকটা মাথা জুড়ে টাক পড়েছিল। এখন বোধহয় টাকটা পুরো হয়ে গেছে। সোনাদা বরাবর গম্ভীর। দেখা হলে হাসে না, কথাও

বেশি বলে না। পাত্তা না দেওয়ার ভাব। কন্তু অমিয় জানে, সোনাদা মানুষটা বাইরে ঐরকম, ওর মুখে কথা কম, ভাবের প্রকাশ কম। কিন্তু এখনো অমিয়কে দেখলে ওর চোখের পাতা কাঁপে। স্নেহে, মমতায়। কত কষ্ট করেছে সোনাদা! বড় কষ্টে মানুষ।

অমিয় স্কুটার থেকে নেমে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কটায় ঢুকে যায়। সোনাদার কাছে কোন কাজ নেই। তবু একবার অনেকদিন বাদে দেখা করে যেতে বড্ড ইচ্ছে করছে। মনটা ভাল নেই।

কাউণ্টারে ভীড়। অজস্র সুন্দর কাউণ্টারে ছাওয়া চারদিক। রঙীন দেওয়াল, টিউব-লাইট—সব মিলিয়ে ব্যাঙ্কটার ভিতরটা বড় চমৎকার।

জিজ্ঞেস করতেই একজন পিওন সোনাদার ঘর দেখিয়ে দেয়। ঘষা কাচের পাল্লা। বাইরে টুলে বেয়ারা বসে আছে। একটা টেবিলের ওপর সাজানো স্লিপ, ডটপেন।

নিজের নাম লিখে অমিয় স্লিপ পাঠায়। একটু পরে বেয়ারা এসে ডাকে।

প্রকাণ্ড টেবিলের ওপাশে সুন্দর পোশাকের সোনাদাকে প্রথমটায় আত্মীয় বলে ভাবতে কষ্ট হয় তার। গোলাপী রঙের টাক মাথায়, নীলাভ কামানো গাল, খুব ব্যস্ত।

একবার চোখ তুলে আবার কাগজপত্রে ডুবে গেল। বসতেও বলল না। অমিও একটু হেসে নিজেই বসে।

সোনাদা ঐরকমই। বসতে বলে না। জানে, বসতে বলার কিছু নেই। অমিয় তো বসবেই। এটা তার সোনাদার ঘর নয় কি?

ছোটবেলা থেকে তারা ভাইবোনরা একে অন্যকে আপন বলে ভাবতে শিখেছিল। যৌথ পরিবার ঐ একটা রক্তের গূঢ় সম্পর্ক তৈরি করে দিয়ে গেছে। এ জীবনে ওটা আর ভাঙবে না।

সোনাদা একবার একফাঁকে প্রশ্ন করে—শরীরটা দেখছি শেষ করেছিস!

—হুঁ।

—কেন ?

—শরীরটা ভাল নেই।

—কোম্পানী লালবাতি জ্বালেনি তো ?

—জ্বালছে।

—জ্বালাই উচিত। তখন যদি ব্যাঙ্কের চাকরিটা নিতিস, আজ কত মাইনে হত জানিস ?

—কত ?

—হাজার খানেকের ওপরে। গর্দভ।

—মাসে ওর চেয়ে অনেক বেশি রোজগার আমি করেছি। ব্যবসা বলে তোমরা গুরুত্ব দাও না। বাঁধা মাইনের লোকেরা ব্যবসাকে ভয় পায়।

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকায়। কোথায় একটা গোপন বোতাম টেপে, বাইরে রি-রি করে বেল বাজে। বেয়ারা এলে সোনাদা চা আনতে বলে। তারপর আবার কাজেকর্মে ডুবে যায়।

ঠাণ্ডা ঘরখানা। অমিয়র ঝিমুনি আসে।

সোনাদা আবার চোখ তুলে তাকে দেখে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—প্রবলেমটা কী ?

—তুমি বুঝবে না। অমিয় শ্বাস ছাড়ে, তারপর বলে—সোনাদা, তুমি কি প্রোমোশন পেয়েছ ?

—চাকরিতে থাকলে প্রোমোশন হয়। তোর মত ব্যবসাদাররা চিরকাল ব্যবসাদার থেকে যায়।

—তুমি কি খুব বড় পোস্টে আছ ?

সোনাদা হাসে। মাথা নাড়ে।

—তাহলে আমার ব্যবসার জন্য তোমার ব্যাঙ্ক থেকে কিছু ধার পাইয়ে দাও না।

—তোকে ধার দেবে কেন ? ইণ্ডাস্ট্রি বা এগ্রিকালচার হলেও না হয় কথা ছিল।

—যদি সিকিউরিটি দেখাই, যদি হাই ইন্টারেস্ট দিই ?

সোনাদা ভ্রু কুঁচকে বলে—তোর আবার সিকিউরিটি কী ? একটা পুরনো স্কুটার, ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায় একখানা ভাগের অফিস। আর কী আছে তোর ? বড়জোর একখানা রিফিউজি সার্টিফিকেট, তা সেখানাও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছিস ! কাজে লাগাতে জানলে রিফিউজি সার্টিফিকেটও একটা মস্ত অ্যাসেট—কিন্তু তা তুই লাগালি কোথায় ?

অমিয় চুপ করে থাকে।

সোনাদা আবার জিজ্ঞেস করে—প্রবলেমটা কী ?

অমিয় উত্তর দেয়—তুমি বুঝবে না। মানুষ কতরকম গাড্ডায় যে পড়ে সোনাদা !

—তোর গাড্ডাটা কী রকম ?

অমিয় শুধু হাসে। চারদিকে একবার তাকায়। যে চেয়ারে সে বসে আছে তা ফোম্ রাবারের গদীওয়ালা, টানলে শব্দ হয় না, ভীষণ ভারী। টেবিলখানা লম্বা এল্-এর মত। ঘষা কাচের দরজা, ঢেউখেলানো কাচ দিয়ে তৈরী ঘরের পার্টিশন। ওপাশে লোকজন চললে কাচের ঢেউয়ে বিচিত্র প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই একখানা চেম্বার করতেই ইন্টিরিয়র ডেকরেটর অন্ততঃ দশ বিশ হাজার কি তারও বেশী নিয়েছে। এ-রকম একখানা অফিস-ঘর বানাবার ইচ্ছে তার অনেকদিনের। হবে না আর। এ-রকম নিস্তব্ধ, কাচের ঘর, মাছি উড়লে যেখানে শব্দ পাওয়া যায়, এ-রকম ঠাণ্ডা ঘর, ফোম্ রাবারের গভীর তলিয়ে-যাওয়া গদী, বিচিত্র ডিজাইনের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, আলো—এইসব আর কোনদিন হবে না।

—লাঞ্চে তুমি কী খাও সোনাদা ?

—তোর মুণ্ডু।

—এই ঘরটা সাজাতে কত খরচ পড়েছে ?

—তোর মত দশটা ব্যবসাদারকে বিক্রি করলে যত ওঠে।

—এরা তোমার বাড়ি-ভাড়া দেয় ? গাড়ি ?

সোনাদা তাকে গ্রাহ্য না করে কাজ করে যায়। কিন্তু সোনাদার কপালে কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দেয়। কাজ করতে করতেও এক-আধবার চোরা চোখে অমিয়কে দেখে নেয়।

অমিয় বলে—উঠি।

—বোস। প্রবলেমটা কী বলে যা।

—কিছু না।

—টাকা সত্যিই চাস?

অমিয় মাথা নাড়ে—না।

—দরকার হলে ম্যাক্সিমাম হাজারখানেক নিতে পারিস। ব্যাঙ্কের টাকা নয়, আমার টাকা।

—কোনদিন নিয়েছি?

সোনাদা চুপ করে থাকে।

অমিয় বলে—তুমি যদি সাপ্লায়ার হতে, কিংবা সুদখোর মহাজন, কি আমার ক্লায়েন্ট, তো নিতাম। তুমি আমার সোনাদা, কিন্তু আমার ব্যবসার কেউ নও। তোমার কাছ থেকে নিলে আমি তোমার আর পাঁচজন আত্মীয়ের মত নীচু হয়ে যাব।

—তার মানে?

অমিয় হাসে—আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে সাকসেসফুল। তোমার কাছ ঘেঁষে বহু আত্মীয় ঘোরাফেরা করে, আমি জানি। কিন্তু তুমি জেনে রেখো, আমি তাদের দলে নই।

সোনাদা একটু হাসে।

—সোনাদা, আমার একটা প্রবলেমের কথা তোমাকে বলব? শুনবে ঠিক?

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। ছোট্ট একটা নড্ করে।

—আমি প্রায়ই একটা স্টীমারঘাটকে দেখতে পাই।

সোনাদা নড়ে-চড়ে বসে বলে—কী রকম?

—আমি যেন উঁচু বালির চড়ায় বসে আছি। অনেক দূর পর্যন্ত

বালিয়াড়ি গড়িয়ে গেছে—আধমাইল—একমাইল—তারপর ঘোলা জল—একটা জেটি—প্রকাণ্ড নদী দিগন্ত পর্যন্ত। কখনো কখনো দেখি, রাতের স্টীমারঘাট—কেবল বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে, জেটির গায়ে জলের শব্দ—ওপারে ভীষণ অন্ধকার। কেন দেখি বল তো?

সোনাদা তাকিয়ে থাকে।

—এ কি মৃত্যুর-প্রতীক নাকি? অমিয় বলে।

—ইয়ার্কী হচ্ছে?

—ইয়র্কী নয় সোনাদা। কাজে কর্মে, ঘুরতে ফিরতে হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে ঐ বালিয়াড়ি, আর বালিয়াড়ির পর জেটি, জল—এই-সব ভেসে ওঠে।

সোনাদার চোখ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ব্যস্ত সোনাদা একটু হেলান দিয়ে বসে। টেবিলের ওপর থেকে হাতড়ে ইণ্ডিয়া কিংসের সোনালী প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ অমিয়র নাকে এসে লাগে। সোনাদার সামনে খায় না, নইলে এই মুহূর্তে তারও একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যৌথ পরিবারের শিকড়-বাকড় সব রয়ে গেছে ভিতরে। সোনাদার সামনে কোনদিনই আর সিগারেট খাওয়া যাবে না।

সোনাদা বলে—এ সবই নস্টালজিয়া। আমারও হয়। দেশের বাড়িতে করমচা তলার ছায়ায় মাটির ওপর শ্যাওলা গজাত। সেই ঠাণ্ডা জায়গাটার কথা হঠাৎ কেন যে মনে পড়ে।

অমিয় মাথা নাড়ে—না এটা শৈশব স্মৃতি নয়। স্টীমারঘাট আমি আর ক'বার দেখেছি! দু তিন বার বড় জোর। তারপরই তো কলকাতায় পার্মানেন্ট চলে এলাম। তাছাড়া সেই স্টীমারঘাট তো দেশে যাওয়ার গোয়ালন্দী ঘাট নয়। এটা কেমন যেন ধু ধু বালুর চর, নির্জন অথৈ ঘোলা জল, ওপারটা দেখা যায় না।

সোনাদা হাসে। বলে—ভাল খাওয়া-দাওয়া কর। হাসিকে নিয়ে কিছুদিন বাইরে টাইরে ঘুরে আয়।

অমিয় অবাক হয়ে বলে—কেন?

—তাহলে ওসব সেরে যাবে।

—সারাতে চাইছে কে? আমার তো খারাপ লাগে না। কলকাতার ভীড়ভাট্টা, গরম, ঘাম, কাজকর্মের ভিতরে মাঝে মাঝে হঠাৎ ছুটি পেয়ে একটা অচেনা স্টীমারঘাটে চলে যাই, বালিয়াড়িতে বসে থাকি, বেশ লাগে। একে সারাব কেন? শুধু জানতে চাইছি, ব্যাপারটা কী। তুমি জানো?

উত্তর দেওয়ার সময় পায় না সোনাদা। স্টেনোগ্রাফার পার্সী মেয়েটি ঘরে ঢোকে। লম্বা ফর্সা, ভাঙাচোরা মুখ। তবু মুখে একটা অদ্ভুত শ্রী আছে। দারুণ একখানা বাটিকের শাড়ি পরনে। মেয়েটা সোনাদার ডানদিকে গিয়ে নিচু হয়ে একটা টাইপ করা চিঠি দেখায়। কথা বলাবলি হয়। ততক্ষণ অমিয় মেয়েটার শাড়ি দেখে। হয়তো বা এরকম শাড়িতে হাসিকে ভাল মানাত। হাসির কথা মনে পড়তেই অমিয়র একধরনের শারীরিক কষ্ট হয়। বুক পেট জুড়ে একটা তীক্ষ্ণ বেদনার আভাষ পাওয়া যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। বুক ধড়ফড় করে। একটা চেক-আপ বোধহয় অমিয়র দরকার ছিল। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, ইর্‌রেগুলার জীবন, অতিরিক্ত চা আর সিগারেট, ব্যবসার উত্তেজনা, শক, সব মিলিয়ে ভিতরটা ভাল থাকার কথা নয়। হাসিকে এই শাড়ীটায় বোধহয় এখনো মানায়। নীলের ওপর হলুদ বাটিকের কাজ। পকেটে একশোর কাছাকাছি টাকা আছে। বাজার ঘুরে একবার খুঁজে দেখবে নাকি শাড়িটা! অবশ্য তা আর হয় না। হাসি বড় অবাক হবে, তাকিয়ে থাকবে, বা দু-একটা বিদ্রূপাত্মক কথাও বলতে পারে। দরকার নেই। হাসি নিষ্ঠুর। তার হৃদয় নেই। মেয়েটা ফাইলিং ক্যাবিনেটে কাগজপত্র ঘাটে। সোনাদা আবার কাজ-কর্মে ডুবে যায়। একজন দুজন করে অফিসে লোকজন আসে। সুন্দর পোশাকের চটপটে লোকেরা। সোনাদা হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করে, চমৎকার ইংরিজিতে কথা বলে। বিজনেসের পিক-আওয়ার।

সোনাদার দম ফেলার সময় নেই।

এক ফাঁকে অমিয় বলে—সোনাদা, উঠি।

কাগজপত্র ঘেঁটে কী একটা খুঁজে পায় সোনাদা। সেটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলে অমিয়কে বলে—সামনের সোমবার নিণ্টুর জন্মদিন। তোর বৌদি হয়তো হাসিকে খবর দিয়েছে। তবু বলে রাখছি, বিকেলের দিকে হাসিকে নিয়ে চলে যাস, রাতে খেয়ে একেবারে ফিরবি।

—আচ্ছা।

—তোর স্টীমারঘাটের ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখব।

অমিয় হাসে। জন্মদিনে যাওয়া হবে না। স্টীমারঘাটের কথা সোনাদা ভুলে যাবে।

ব্যাঙ্কটা থেকে বেরোতেই জ্বোরো কলকাতা চেপে ধরে। কী তাপ রোদের! গুমোট।

অমিয় তার স্কুটার চালু করে। কোথায় যাবে, ভেবে পায় না, তবু যায়। যেতে থাকে।

টিফিন। কিন্তু টিফিনের সময়েও সোমাদি বাইরে যায় না, আড্ডা মারে না। নিজের জায়গায় বসে থাকে। প্রকাণ্ড হলঘরের একধারে টাইপিস্টদের সারি সারি মেশিন। সব খালি। কেবল সোমাদি ঠিক বসে আছে। ডান হাতে একখানা এক-কামড় খাওয়া টোস্ট, আলতো ভাবে ধরা, বাঁ-হাত মেশিনে ছোবল মারার জন্য উদ্যত। অমিয় এগিয়ে যেতে শুনল টুক করে মেশিনের একটা অক্ষর লাফিয়ে উঠল। অমিয়র করুণা হয়।

সোমাদির বয়স পঁয়তাল্লিশের নীচে নয়। সিঁথির কাছে চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চোখে প্লাস পাওয়ারের চশমা। রোগা

গড়নের বলে বয়স খুব বেশী দেখায় না, কিন্তু দীর্ঘদিনের ক্লান্তির ছাপ আছেই। নাকের দুধার দিয়ে গভীর রেখা নেমে গেছে, মেচেতার ছোপ ধরেছে মুখে। বছরে বড়জোর এক দুদিন ছুটি নেয়। চৌদ্দ বছর টানা চাকরি করছে আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কন্ট্রোলে, তবু চাকরি পাকা হয় নি। কন্ট্রোল উঠে যাবে বলে চাকরি কারোই পাকা নয় এখানে। ওর বিয়ের জন্য কেউ তেমন করে চেষ্টাই করল না। পিসেমশাই মারা যাওয়ার পর একটা চাকরিতে ঢুকেছিল, তারপর চাকরিই করে গেল। বার দুই দুটি ছেলেকে বোধহয় ভাল লেগেছিল। তাদের একজন ছিল ভিন্ন জাতের, অন্যজনের ছিল কম বয়স। হল না। হবেও না। সোমাদি তা জানে বলেই কোথাও আর যায় না। মন-প্রাণ দিয়ে চাকরি করে! ছুটি পেলে হাঁফ ধরে যায়।

টোস্টটা আর এক-কামড় খাওয়ার জন্য মুখের কাছে এনে সোমাদি তাকায়। প্রথমটায় বোধহয় চিনতেই পারে না। তাকিয়ে থাকে।

—সোমাদি, কেমন আছ?

সোমাদি টোস্টটা রেখে দিয়ে একটু চেয়ে থেকে বলে—বেরো, বেরিয়ে যা।

—কেন?

—লজ্জা করে না? একবছরের মধ্যে একবার মাকে দেখতে যাওয়ার সময় হয় নি? কতবড় অসুখ গেল মা-র, তোকে দেখার জন্য আকুলি ব্যাকুলি, তিনটে চিঠি দিলাম, একটা উত্তরও দিসনি। বেরো—কেন এসেছিস?

—তুমি কত মাইনে পাও?

—তাতে কি দরকার? চালাকি ছাড়।

—চালাকি না। সত্যিই জিজ্ঞেস করছি।

—ভারি তো ব্যবসা। অফিসে মাছি ওড়ে, সেই ব্যবসা করেই তোর সময় হয় না। অমানুষ!

একটা চেয়ার টেনে অমিয় বসে নিজের থেকেই। মাঝখানে মেশিন, ওপাশে সোমাদি। বলে—এর পরের জেনারেশনে আর এইসব চোটপাট শোনা যাবে না সোমাদি। যা বকাবকি করার তা তোমরাই করে নিলে।

—তার মানে ?

—আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে একটা ফ্যামিলি আছে। স্বামী স্ত্রী আর বাচ্চা ছেলে একটা। একদিন সাজগোজ করে বিকেলে কোথায় বেরোচ্ছে, ছেলেটার গাল টিপে জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাচ্ছ বাবু ? সে উত্তর দিল—ঠাকুমার বাড়ি। বুঝলে সোমাদি, কথাটা সেই থেকে বুকে মাঝে মাঝে ধাক্কা দেয়। ঠাকুরমার বাড়ি! মাই গড, ঠাকুরমার বাড়ি যে একটা আলাদা বাড়ি, সেখানে যে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়া যায় তা আমারা ভাবতেই পারি না এখনো। ঠাকুমার বাড়ি আবার কী। ঠাকুমা যে আমাদের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশে আছে—তার বাড়ি কী করে আলাদা বাড়ি হয়। এই যে তুমি আমাকে বকছ, পিসিমাকে দেখতে যাইনি বলে, এসব সম্পর্কের টান আমাদের সময়েই শেষ। এরপর পিসতুতো মামাতো ভাইবোনে দেখা হলে হয়তো হাতজোড় করে নমস্কার করবে, আপনি আপনি করে কথা বলবে। বলবে—একদিন কিন্তু আমাদের বাড়িতে যাবেন, কেমন। খুব খুশী হব।

সোমাদি একটু হাসে। বলে—তোর সঙ্গে তো আমাদের সম্পর্ক ভাই দাঁড়িয়ে গেছে। একবছরে ঢাকুরিয়া থেকে বেহালা যাওয়ার সময় হয় না, কী করে বুঝব যে সম্পর্ক রাখতে চাস ?

—গত একবছর ধরে আমি ভাল নেই সোমাদি।

—কী হয়েছে ?

—তুমি কত মাইনে পাও বললে না ?

—জেনে কী হবে ?

—এমনিই। কৌতূহল। বল না।

—সব কেটে ছেঁটে পৌনে তিনশো। হাসি কেমন আছে?

—ভাল। গত বছর তুমি একটা স্টীলের আলমারী কিনেছ, আর একটা সিলিং ফ্যান, না?

সোমাদি হাসে—এ বছর একটা সূতোর কার্পেট কিনেছি, ড্রেসিং টেবিল করেছি, গ্যাসের উনুন কিনেছি। দেখে অসিস।

—পৌনে তিনশোর মধ্যে কী করে ম্যানেজ করো? তোমার তো উপরিরও রাস্তা নেই।

—এইসব জানতেই এসেছিস? হাসিকে নিয়ে কবে যাবি বল?

—তোমার পোষ্যও তো কম নয়। পিসিমা, নীতা, তোমার এক জ্যাঠতুতো ভাই তোমার কাছেই থাকে, কী করে ম্যানেজ করো?

—কী করব! তোরা ভাইরা তো আর মাসোহারা দিস না, ওতেই কষ্টে-সৃষ্টে ম্যানেজ করে নিই। একটা টোস্ট দিয়ে টিফিন সারি, বিড়ি-সিগারেট খাই না, সাদামোটা পোশাক করি, সিনেমা দেখি কালে-ভদ্রে, কোথাও বেড়াতেও যাই না। তোদের তো তা নয়। হাসির খবর কিছু বললি না, বাচ্চা কচ্চা হবে নাকি?

—তুমি খুব কষ্ট করো, না সোমাদি?

—দূর পাগলা, তোর হয়েছি কী? এসব বলছিস কেন?

—তুমি এত কষ্ট করছ কেন?

—কেন আবার, নিজের জন্য।

—দূর! নিজের জন্য কষ্ট করে সুখ কী। কষ্ট করলে করতে হয় ভালবাসার মানুষের জন্য। তুমি সবচেয়ে বেশী কাকে ভালবাস সোমাদি?

—কী জানি? তোর হয়েছে কী?

—কিছু না।

—হাসিকে নিয়ে কবে যাবি? হাসি তো আমাদের ভাল করে চিনলই না।

—যাব একদিন ঠিক। আগে বল, তুমি কার জন্য এত কষ্ট করছ?

—বললাম তো, নিজের জন্য।

—তবে তো তুমি নিজেকে ভালবাসো।

—বললাম তো, বাসি।

—আমি বাসি না।

—তুই হাসিকে বাসিস। ভালবাসলেই হল।

—নিজেকে ভালবাসলে হাসিকেও ভালবাসা যায়। এই যে তুমি নিজেকে ভালবাসো বললে, স্বামী-পুত্র হলে তাদেরও বাসতে, বাধা হত না। ভালবাসা তো মাস-মাইনে নয় যে টান পড়বে।

—হাসির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি? কী হয়েছে বল? দরকার হলে আমি না হয় গিয়ে হাসিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিটমাট করে আসি। মাত্র তিন বছর হল বিয়ে, এখনই ঝগড়াঝাঁটি হলে—

—পাকামী করো না। ম্যারেড লাইফ সম্পর্কে তুমি কী জান? ঐ ব্যাপারে আমি তোমার সিনিয়র।

—তা হলে এই গরম দুপুরে ঘামে নেয়ে এসে ভালবাসা-ভালবাসা করছিস কেন? কিছু খাবি? বেয়ারা ডেকে কিছু আনিয়ে দিই! একটা ডিমভাজা—না গরমে একটু দৈ খাবি?

—আমার মুশকিল কি জানো?

—কী?

—আমি হাসিকে ভালবাসতাম, ব্যবসাকে ভালবাসতাম, স্কুটারকে ভালবাসতাম, কিন্তু এইসব ভালবাসার মধ্যে মাঝে মাঝে একটা স্টীমারঘাট এসে পড়ছে।

—স্টীমারঘাট?

—হুঁ।

সোমাদি চেয়ে থাকে। বলে—কী বলছিস?

—খুব উঁচু বালিয়াড়ি থেকে তুমি কখনো কোন নির্জন ফেরীঘাট

দেখেছ? একটা জেটি—তারপর বিশাল ঘোলা জলের নদী—ওপারটা ধূ-ধূ করে—দেখা যায় না। দেখেছ? আমি চোখ বুজলেই দেখি।

সোমাদির মুখটা কেমন হয়ে যায় যেন। বয়েস হয়ে যাওয়া, কৃচ্ছ্রসাধনের ছাপ-ওলা নীরস মুখ সোমাদির। তবু কয়েক পলকের জন্য যেন একটা কোমলতা গাছের ছায়ার মত মুখে খেলা করে। মুখের কর্কশ রেখাগুলি লাবণ্যের সঞ্চারে হঠাৎ ডুবে যায়।

—কোন স্টিমারঘাটের কথা বলছিস? কলকাতার গঙ্গা, নাকি গোয়ালন্দ, আমিনগাঁতেও ফেরীঘাট দেখেছিলাম।

—ওসব নয়। এ একটা অন্যরকম ফেরীঘাট। বহু দূর পর্যন্ত বালিয়াড়ি, তারপর ঘোলা জল—চোখ বুজলেই দেখতে পাই। ভীষণ ভয় করে, আবার ভীষণ ভালও লাগে।

—আমি ঠিক জানি, তুই হাসির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস। কিংবা ব্যবসাতে মার খেয়েছিস। কত টাকা রেখে গিয়েছিল মামা?

—হাজার দশেক।

—সেটাই ভুল হয়েছিল। কে যে তোর মাথায় ব্যবসা ঢুকিয়েছিল! বাঙালী ছেলে আবার কবে ব্যবসা করতে শিখেছে! তার চেয়ে একটা বাড়ি করে ভাড়াটে বসিয়ে গেলে—

—স্টীমারঘাটটার কথা তুমি কিছু জান না, না,?

—কী জানব? তোর মাথায় যতসব পাগলামীর পোকা। হাসিকে নিয়ে কবে আসবি বল?

—তোমার কিছু মনে হয় না? স্টীমারঘাট বা ওরকম কিছু?

সোমাদি হাসে। বলে—আচ্ছা জ্বালাতন! ভাবনা-চিন্তা করার সময় কোথায় আমার বল তো! সকাল সাড়ে আটটার লেডীজ স্পেশাল ধরতে বেরোই, মাইলখানেক হেঁটে বাস-রাস্তা, অফিসে সারাক্ষণ কাজ, ফিরতে ফিরতে আটটা হয়ে যায়। তখন শরীরে থাকে কী? খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্নও দেখি না।

অমিয় শ্বাস ফেলে। বলে—তুমি কাঠ হয়ে গেছ।

একটু ইতস্তত করে সোমাদি বলে—তবে দেশের পুকুরঘাটের কথা মনে পড়ে। খুব বড় বড় কচুপাতা বাতাসে নড়ত। মাছ ফুট কাটত জলে। কদমগাছের ছায়ায় আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলতাম। মনে হওয়ার কি শেষ আছে! কত কী মনে হয়। ওসব নিয়ে ভাবনার কী। হাসির সঙ্গে ভাব করে ফেল। ফেরার সময়ে একখানা শাড়ি আর দুটো সিনেমার টিকিট কিনে নিয়ে যা। কালকের দিনটা হোটেল-রেস্টরেন্টে খাস। এরকম একটু আধটু করলেই দেখিস আর ঝগড়া হবে না।

—তুমি এইসব কবে থেকে ভেবে রেখেছ সোমাদি! বিয়ে হলে বরের সঙ্গে কী রকম সব মান-অভিমান হবে, সব ভেবে রেখেছিলে। আর বলছ, ভাববার সময় পাও না!

সোমাদি হেসে ওঠে। বলে—ঠিক বলেছিস।

একজন দুজন করে মেশিনগুলোর সামনে মেয়েরা এসে বসছে। টিফিন শেষ।

অমিয় উঠে দাঁড়ায়।

—চলি।

সোমাদি প্লাস পাওয়ারের চশমার ভিতর দিয়ে তাকায়। চোখে অন্যমনস্কতা। বলে—সম্পর্কটা রাখিস অমিয়। মাকে গিয়ে দেখে আসিস। হার্ট ভাল না, কখন কী হয়ে যায়!

—যাব।
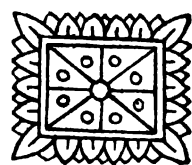
অফিসে এসে অমিয় দেখে, কেউ নেই। দুপুরের ডাকে ইন্সিওরেন্সের একটা চিঠি এসেছে। গতবছরের প্রিমিয়াম বাকী। বছর তিনেক আগে, বিয়ের পরই দশ হাজার টাকার একটা পলিসি করিয়েছিল। দুবছর প্রিমিয়াম টেনেছে। যাকগে, পেইড্-আপ্ হয়ে যাবে।

গ্লাসের নীচে চাপা দিয়ে কল্যাণ একটা চিঠি রেখে গেছে—বাগচী, হায়দার তাগাদায় এসেছিল। ভুজুং-ভাজুং দিয়ে বিদায় করেছি। ইনকাম-ট্যাক্সের অজিতকে একবার ফোন করবেন, ওকে আপনার কথা বলা আছে। ওর দাদা একটা লোন সোসাইটির মেম্বার, একটা লোন পাইয়ে দিতে পারে। আমি সিনেমায় যাচ্ছি, আজ ফিরব না। রাজেনের কাছে চারশো টাকা রাখা আছে। কাল সকালেই গিয়ে মিশ্রিলালকে দিয়ে আসবেন। ফুড-সাপ্লাইটা ছাড়বেন না···

চোখটা একটু ঝাপসা লাগে। চিঠিটা রেখে দেয় অমিয়। অফিস-ঘরটা নির্জন। পাখার হাওয়ায় কোথায় যেন একটা কাগজ উড়বার শব্দ হয় কেবল। অমিয় বসে হাই তোলে। তারপর টেবিলে মাথা রেখে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে।

বিকেলের দিকে রজত ফিরে এসে ডাকে—বাগচী—

—উঁ।

—আমার কাছে কেউ এসেছিল?

—না।

—দূর! কেউ আসে নি!

—রাজেনকে জিজ্ঞেস করুন তো।

—করেছি। ও তো বিশবার বাইরে যাচ্ছে চা খাবার সিগারেট

আনতে। আমার মোটর পার্টস্‌টা দিয়ে গেল না শালা রায়চৌধুরী! কাল ডেলিভারী নিতে আসবে।

অমিয় আড়মোড়া ভাঙে। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। বাইরে এখনো ফর্সা রোদ।

রজত তার চেয়ার টেনে বলে—ব্যবসার মুখে পেচ্ছাপ। ভিসা পেয়ে যাচ্ছি কাল।

—কবে রওনা?

—দিন পনেরোর মধ্যে। প্রথমে ডুসেলডর্ফে যাব মাধুর কাছে। সেখান থেকে বন্‌ হয়ে কাজের জায়গায়। দাঁড়ান, আজ আমি চা খাওয়াব, সন্দেশ খাবেন?

—খাব। খুব খিদে পেয়েছে। অমিয় বলে।

বেল বাজায় রজত। রাজেন এলে চা সন্দেশ আনবার পায়সা দেয়। তারপর অমিয়কে বলে—খুব দামী সিগারেট কী আছে বলুন তো?

—আপনি তো খান না।

—আজ খাব।

—ইণ্ডিয়া কিংস্‌।

রাজেনের দিকে ফিরে রজত বলে—ইণ্ডিয়া কিংস এনো, এক প্যাকেট, আর দেশলাই। বাগচী, যাওয়ার আগে একটা পার্টি দেব।

অমিয় হাসে।

—শুধু একটা ভয়, বুঝলেন বাগচী!

—কী?

—এর আগে গুরুপদ গিয়েছিল। ল্যাংগুয়েজ জানত না বলে ওকে ফেরত পাঠিয়েছে। আমিও ভাল জানি না। ওদিকে ব্রজগোপালদাকে দিয়ে জার্মান ভাষায় করেসপণ্ডেন্স করেছি, নিজে শেখবার সময়ই পেলাম না। শেষে গুরুপদর মত ফেরত পাঠাবে

না তো ?

—সকলের কপাল সমান না।

চেয়ারটা পিছনে হেলিয়ে একটু দোল খায় রজত। ভাবে। বলে—অবশ্য মাধুও জানত না। ওর কোম্পানী ওকে তবু রেখে দিয়েছে।

অমিয় রজতকে একটু দেখে। অন্তত দশ বছরের ছোট রজত। বাচ্চা ছেলে। কোন জমিতেই শেকড় নেই। কলকাতায় জন্ম-কর্ম। অমিয়র মনে হয়, কলকাতায় জন্মালে মাটির টান থাকে না। রজতের খুব ইচ্ছে, আর ফিরবে না। একটা আবছায়া স্টিমারঘাট চোখের সামনে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অমিয় ক্যালেণ্ডারের ছবিটা দেখে। একটা মেয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় একটা কলসী, কোমরের কলসীটা কাৎ করে ধরা তা থেকে অঝোরে জল পড়ে যাচ্ছে।

রজত মুখ তুলে বলে—আমার একটা লাভ অ্যাফেয়ার প্রায় ম্যাচিওর করে এসেছিল, বুঝলেন বাগচী!

—হুঁ।

—সেটার কি করব বলুন তো?

আপনার কী ইচ্ছে?

—ইচ্ছে নেই।

অমিয় চেয়ে থাকে।

রজত আবার বলে—চলেই যাচ্ছি যখন, তখন আবার এখানে একটা ফ্যাকড়া রেখে যাই কেন! মেয়েটা হয়তো অপেক্ষা করবে। করতে করতে বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাবে। এক ফাঁকে এসে অবশ্য বিয়ে করে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু তার আর কী দরকার! ওখানেই যখন বরাবর থাকব তখন ওদিকেই বিয়ের সুবিধে। তাই মেয়েটাকে সব বুঝিয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাব। ভাল হবে না?

অমিয় মাথা নেড়ে বলে—হবে।

রজতকে খুশি দেখায়। সে একবার শিস্ দেয়, দু'কলি গান গুণ গুণ করে গায়।

কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। কেউ আসছে। টপ করে নিজের অজান্তেই উঠে পড়ে অমিয়।

—রজতবাবু, কেউ এলে কাটিয়ে দেবেন। আমি বোসের ঘরে ফোন করতে যাচ্ছি।

রজতের অভ্যাস আছে। অনেকদিন ধরেই অমিয়র সময় ভাল যাচ্ছে না। রজত মাথাটা হেলিয়ে একটু হাসল—ঠিক আছে ঠিক আছে। বাগচী, উই আর কমরেডস আফটার অল—

সিঁড়ি দিয়ে যে উঠছে সে যে-ই হোক অল্পের জন্য অমিয়কে ধরতে পারল না। অন্ধকার প্যাসেজটা প্রায় লাফিয়ে পার হয়ে এল অমিয়।

বোস বুড়ো মানুষ। দুই ভাই পাশাপাশি চেয়ারে বসে থাকে। এক সময়ে ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার হিসেবে একটু নাম ছিল। এখন কিছু নেই। অফিস আছে। এই পুরো তিনতলাটা তাদের লীজ নেওয়া। লীজ নিয়ে কল্যাণের তৃষ্ণা, এবং আরও কয়েকজনকে অফিস ভাড়া দিয়েছে। ওইটাই আয় এখন। জটাওয়ালা একজন তান্ত্রিক এসে প্রায়ই দুই ভায়ের মুখোমুখি বসে থাকে। আজও আছে। ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরে তিনজন বয়স্ক, নিস্তব্ধ মানুষ। কোন কাজ নেই।

টেলিফোনটার সামনে একটু দাঁড়ায় অমিয়। কাকে ফোন করবে বুঝতে পারে না। কোন নম্বর মনে আসে না। তবু হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নেয়, ডয়াল টেনে শোনে। কিড়-কিড় শব্দ হয়। কোন নম্বর মনে আসে না। তবু অমিয় আঙুল বাড়ায়। দুইয়ের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে ডয়াল ঘোরায়। তরপর তিন, চার, পাঁচ, ছয় সাত···। অপেক্ষা করে। টেলিফোন একটু নিস্তব্ধ থাকে। তারপর খুট করে একটা শব্দ হয়। পরমুহূর্তে হঠাৎ অমিয়কে চমকে

দিয়ে ওপাশে একটা দীর্ঘ টানা মুমূর্ষু চীৎকার শোনা যায়—অমিয়—ও—ও, অমিয়—ও—ও, অমিয়—ও—ও—

অমিয় কেঁপে ওঠে প্রথমে। 'কে?' বলে চীৎকার করতে গিয়েও থেমে যায়। তারপর বুঝতে পারে, ওটা এনগেজ্‌ড্‌ সাউণ্ড। ধীর কান্নার মত বিষণ্ণ শব্দ। কতবার শুনেছে সে। আসলে মনটা ঠিক জায়গায় নেই। ফোনটা আবার রেখে দেয় অমিয়। দাঁড়িয়ে থাকে। একটু আগে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কে উঠে এল তা ভাবতে চেষ্টা করে। অন্ধকার সিঁড়িতে আবছায়া নতমুখ একটা অবয়বকে এক ঝলক দেখেছিল। একটু সময় কাটানো দরকার।

আবার ডায়াল ঘোরায় অমিয়। সম্পূর্ণ আন্দাজে। কোন নম্বরে আঙুল তা তাকিয়ে দেখে না। খুব খিদে পেয়েছে অমিয়র। মুখটা তেতো-তেতো। বোধহয় পিত্তি পড়েছে। সকাল থেকে সে প্রায় কিছুই খাইনি। মাথাটা ঘোরে। শরীর দুর্বল লাগে। এর পর থেকে অফিসের নীচে, খোলা রাস্তায় আর স্কুটারটা রাখা যাবে না। নীচে স্কুটারটা দেখে সবাই বুঝতে পারে, অমিয় অফিসে আছে। আহামদকে বলবে একটা গোপন জায়গার বন্দোবস্ত করতে। ঘড়ির দোকানের পাশে একটা এঁদো গলি আছে—সেখান রাখলে কেমন হয়?

ফোনটা কানে চেপে ধরে থাকে অমিয়। ডায়াল টোন থেমে গেছে। এইবার নম্বর আসবে। অমিয় অপেক্ষা করে। স্পষ্ট শুনতে পায় ওপাশে দু-একটা কলকব্জা নড়ছে, লিভার উঠছে। প্রথমে ভার্টিকাল তারপর হোরাইজন্টাল খোঁজ শুরু করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। কিন্তু নম্বরটা খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজছে—প্রাণপণে খুঁজছে যন্ত্রটা। খুঁজে পাচ্ছে না। অমিয় অপেক্ষা করে। যন্ত্রের শব্দ থেমে যায়। নম্বরটা কি পাবে না অমিয়? সে অপেক্ষা করে।

যন্ত্রটা অস্ফুট শব্দ করে, তারপর প্লাগ দেয়। রিং করার শব্দ হয় না, এনগেজ্‌ড্‌ থাকারও শব্দ হয় না। কিন্তু তবু কনেকশন ঠিকই

পায় অমিয়। স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওপাশে টেলিফোন হাতে নিয়েছে এক গভীর নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতায় খুব উঁচু থেকে বালিয়াড়ি নেমে গেছে বহুদূর। ধু ধু বালিতে শব্দহীন জ্যোৎস্না পড়ে আছে। হাড়ের মতন সাদা বালি—গড়ানে—তারপর অন্ধকার জেটি, ঘোলা জল। শেয়ালের চোখের মত চক চক করে ওঠে জোনাকি পোকা। এ-পাড়ে দিনের আলো থেকে ও-পাড়ে গভীর রাতের মধ্যে চলে যায় টেলিফোন। সেখানে বাতাসের শব্দ নেই, জলের শব্দ নেই। বালির ওপরে একটা সাপের খোলস উল্টে পড়ে আছে। বালিতে ঢেউয়ের দাগ। বহু দূর-দিগন্তব্যাপী সেই নিস্তব্ধতা টেলিফোন ধরে থাকে ওপাশে। অমিয় সেই নিস্তব্ধতাকে শোনে।
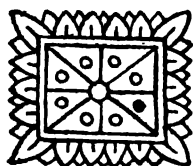
ক'দিন ধরেই ইঁদুরের খুটখাট সারা বাড়িময় শুনছে হাসি। কখনো ওয়ার্ডরোবে, কখনো খাটের তলায়, জুতোর র‍্যাকে, রান্নাঘরে। অবিরল দাঁতে কেটে দিচ্ছে সংসার। নিশুত রাতে ঘুম ভেঙে মাঝে মাঝে শুনেছে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে চিঁ-চিক-চিক আনন্দিত চিৎকার ছুটে যাচ্ছে। কুড়-কুড় কুড়-কুড় কাটার শব্দ হয়েছে। হাসি তেমন গা করেনি। কাটছে কাটুক।

সকালে অমিয় বেরিয়ে যাওয়ার পরই হাসি গোছগাছ করতে বসেছে। থাকে থাকে শায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার জমে গেছে। এতসব পরার সময় হয় নি। ট্রাঙ্ক ভর্তি রয়েছে শাড়ি, র‍্যাকে নানারকমের জুতো, ড্রেসিং টেবিলে সাজগোজের অসংখ্য টুকি টাকি। এসব

কিছুই নেবে না সে। দু-চারটে মাত্র নেবে—যা নাহলে নয়।

নীচের থাক নাড়া দিতেই হাসি দেখতে পায় ইঁদুরের কাটার চিহ্ন। তার শায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারের এখানে-সেখানে ফুটো। গরম জামার থাক ভর্তি জামাকাপড় কেটে রেখেছে। কত কি কেটেছে দেখার জন্য হাসি সব জামাকাপড় নামিয়ে মেঝেতে স্তূপ করে। একটা পুরোনো ফুলহাতা সোয়েটারে জড়ানো দু-বাণ্ডিল চিঠি। চিঠির বণ্ডিল তুলতেই ঝুর-ঝুর করে কাগজের টুকরো ঝরে পড়ে। অমিয় দু দফায় দিল্লি আর কানপুর গিয়েছিল। প্রথমবার দু-মাস, দ্বিতীয়বার মাসখানেকের জন্য। আর দুবার বাপের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন করে ছিল হাসি। সেইসব সময়ে অমিয় লিখেছিল এইসব চিঠি। ইঁদুর নষ্ট করে গেছে। সবচেয়ে ওপরের চিঠিটা খুলে কয়েক পলক দেখে হাসি। ছিদ্রময় প্রেমপত্র। 'প্রিয়তমাসু…' হাসি পড়তে থাকে—'তোমার জন্য ভীষণ (ফুটো) হয়ে আছি। কবে আসছ? তোমার জন্য এমন (ফুটো) লাগছে যে কি বলব। আমার (ফুটো) ভিতরটা তো তুমি (ফুটো) পাও না…রাণী আমার, আমার (ফুটো), কবে (ফুটো)? তোমার জন্য আমি সব (ফুটো) পারি। তাড়াতাড়ি চলে (ফুটো)…'

হাসি একটু হাসে। চিঠিটা দেখে নয়। প্রেমপত্র লিখতে অমিয় জানে না। দু-চারটে দুর্দান্ত এলোমেলো আবেগের লাইন লিখেই তার সব কথা ফুরিয়ে যায়। কোনো ইন্‌ল্যাণ্ডের একটার বেশী স্ট্যাপ ভর্তি করতে পারেনি সে।

ছিদ্রময় এই চিঠিগুলো নিয়ে কি করবে তা ঠিক করতে পারে না সে। নিয়ে যাবে? নাকি পুড়িয়ে ফেলবে? ভাবতে ভাবতেই আবার পুরনো পুলওভারে চিঠিগুলো জড়িয়ে ওয়ার্ডরোবে আগের জায়গায় রেখে দেয়। থাকগে। থাকতে থাকতে একদিন পুরোনো হয়ে হয়ে ধুলো হয়ে যাবে আপনা থেকে।

মধুকে ডেকে হাসি ন্যাপথলিন আনতে বলে, আর ইঁদুর মারা

বিষ। তারপর একে একে ট্রাঙ্ক বাক্স, স্টিলের আলমারী—সবই খুলে ফেলে সে। জামাকাপড় নামায়, ছিদ্র খুঁজে দেখে। সব জায়গাতেই হয়েছে ইঁদুরের দাঁতের দাগ। ভিতরে ভিতরে সব ফোঁপরা করে দিয়ে গেছে। আবার সব গোছ করে তুলতে বেলা গড়িয়ে যায়। সঙ্গে নেওয়ার জন্য সাদামাটা কয়েকটা জামাকাপড় আলাদা করে রাখে হাসি। দু একটা প্রসাধন। কিছু টাকা। কবে যাওয়া হবে তার কিছু ঠিক নেই। দার্জিলিং মেলে এখন সামার-রাশ। জামাই-বাবুকে রিজার্ভেশন করতে বলা আছে।

ঘর-দোর আবার ঝাঁট দেয় হাসি, আটার গুলিতে বিষ মিশিয়ে রাখে ওয়ার্ডরোবে, খাটের তলায়, রান্নাঘরে। স্নান করে খেয়ে উঠতে বেলা দুটো বাজে।

মেঝেয় শতরঞ্চি পেতে একটু গড়িয়ে নেয় হাসি। মেঝে থেকে শীতভাব উঠে আসে শরীরে। বাইরে রোদের মুখে ছায়া পড়েছে। মেঘ করল নাকি! বুকের ওপর সিলিং ফ্যানটার ঝকঝকে ইস্পাতের রঙের ব্লেডগুলো একটা প্রকাণ্ড স্থির বৃত্ত তৈরী করেছে। ঘূর্ণীঝড়ের মত। বাতাস নেমে এসে মেঝেতে চেপে ধরে হাসিকে। মধু রান্নাঘর ধোলাই করছে। কলঘরে জলের শব্দ। দূরে মেঘ ডাকছে। জানালা-দরজায় সবুজ পর্দা ফেলা। ঘরে একটা সবুজ আভা। হাসি একটু চেয়ে থাকে, কিন্তু কিছুই দেখে না। দেখার জন্য সে চেয়েও নেই। দুই ঘরের এই যে ছোট্ট বাসা, এই কি সংসার? খাট, আলমারী, খাওয়ার টেবিল, ড্রেসিং টেবিলের আয়না—দৃশ্যমান যা কিছু আছে, যা ধরা-ছোঁয়া যায় তার কোনোটাই কি একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষকে আটকে রাখতে পারে? ঘরে দরজা দিয়ে দাও, শরীরে শরীরে মিশিয়ে ফেলে, সারাবেলা বল ভালবাসার কথা, পোষা পাখীর মত, ওয়ার্ডরোবে জমে উঠুক প্রেমপত্র—তবু কিছুই প্রমাণ হয় না। সরকারী দপ্তরে হাসি আর অমিয়র বিয়ের দলিল নব্বই কি একশো বছর ধরে জমা থাকবে—অতদিন ধরে তাতে লেখা থাকবে যে তারা

আইনগত ভাবে স্বামী-স্ত্রী। তবু কিছুই প্রমাণ হয় না। হাসি পাশ ফিরে শোয়।

খামের ওপর সাঁটা একটা ডাকটিকিট জলে ভিজিয়ে খুব সাবধানে তুলে নিচ্ছে হাসি। খামের ওপর টিকিটের চৌকো চিহ্ন একটা থেকে যাবে—থাকগে। নাকি কোনদিনই টিকিটটা ঠিকমত সাঁটা ছিল না খামের গায়ে? দুটো শরীর কেবল পরস্পরকে ডাকাডাকি করেছে এতকাল? মন নয়, বিশ্বাস নয়, নির্ভরতা নয়।

ছেলেবেলা থেকেই তার মন বলত—কলকাতা কলকাতা!

গরীব ঘরেই জন্ম হয়েছে হাসির। তার বাবা কাছাড়ের এক ছোট্ট চা-বাগানের কেরানী। তারা ছয় ভাইবোন। হাসি চতুর্থ। লেখাপড়ার কোন সুযোগ ছিল না। শিলচরে থাকত এক মাসী, তার ছেলেমেয়ে নেই। সেই মাসীই নিয়ে গেল হাসিকে, পালত পুষত। শিলচর কলেজ থেকেই সে বি-এ পাস করে, শিলচরেই শেখে মণিপুরী নাচ। লেখাপড়া, নাচ, গানবাজনা—এ সবই হাসি শিখত প্রাণ দিয়ে। এই সব লোকে শেখে কত কারণে। হাসির কারণ ছিল ভিন্ন। হাস্যকর সে কারণ, তবু কত সত্য।

ছেলেবেলা থেকেই তার মন বলত—কলকাতা, কলকাতা! চা-বাগানে তার ছেলবেলা কেটেছে। চারদিকে ঘন গাছের বেড়াজাল, বৃষ্টি পড়ত খুব, আবার রোদ উঠলে চ-পাতার মাতলা গন্ধে ম-ম করত বাতাস। রাতে ফেউ ডাকত, শেয়াল কাঁদত, তাদের বাড়ির আনাচে-কানাচে এঁটোকাঁটা খেতে আসত শুয়োরের মত মুখওয়ালা বাগডাশা। ঝিঁঝিঁর ডাক রাতে অরণ্যকে গভীর করে তুলত। শীতকালে পড়ত অসহ্য শীত, মাটির তাপ কুয়াশার মত হয়ে বর্ষাকালে চরাচর আড়াল করত। পাহাড়ী পথ হঠাৎ বাঁক ঘুরে রহস্যে হারিয়ে গেছে। তারা ভাইবোনরা উৎরাই ভেঙে দৌড়ে দৌড়ে খেলত ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা। দীনদরিদ্র ছিল তাদের পোষাক, আসবাব। তাদের ছোট্ট বাড়িটিতে তাদের অতজনের ঠিক আঁটত না। সেই

বাগানে তার ছেলেবেলায় প্রথম বাবার কাছে কলকাতার গল্প শোনে। বেশীরভাগই কলকাতার দৃশ্যের গল্প, গাড়িঘোড়া আলো দোকান আর লোকজনের গল্প। বাবা গল্পবলতেন সুন্দর আস্তে আস্তে, সময় নিয়ে প্রতিটি দৃশ্য যেন নিজেও প্রত্যক্ষ করতেন। সেই সব গল্পে তাঁর যৌবনকালে কলকাতার ছাত্রজীবনের নানা দীর্ঘশ্বাস মিশে থাকত। আর থাকত কলকাতা ছেড়ে আসবার বিরহ-যন্ত্রনা। হাসির মনে সেই প্রথম কলকাতার নাম বীজের মত ঢুকে যায়। সে বাবাকে বলত—চল না বাবা, কলকাতা যাই। বাবা স্থির থেকে বলত—দূর! আর যাওয়া হবে না। সেখানে আমাদের আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, কোন কাজও নেই সেখানে, খামোখা টাকা-পয়সা খরচ করে চারদিনের রাস্তার ধকল সয়ে কার কাছে যাব? হাসির মন বলত—কেন, কলকাতার কাছে।

শিলচর ছিল সুন্দর ছিমছাম শহর। লোকজন বেশী না, গাড়িঘোড়া বেশী না, চারদিকে জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট শহর। সেখানে মাসীর বাড়িতে এসে সে প্রথম শহরের স্বাদ পায়। সুন্দর সেই স্বাদ। তখন তার মনে কলকাতার বীজটি কেটে অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। সে বুঝতে পারে—শহর—শহরের মত জায়গা নেই। সাতবছর সে শিলচরে কলকাতার আরো বিচিত্র গল্প শোনে বন্ধুবান্ধবীর কাছে। মাসীদের আত্মীয় হারুকাকার ক্যান্সার হয়েছিল, সে গেল চিকিৎসার জন্য কলকাতায়। শচীন নামে কলেজের একটি ছেলে বেশ কবিতা লিখত, সে গেল কলকাতায় বড় কবি হওয়ার জন্য। অনুরাধা ক্লাসিকাল গাইত গৌহাটি রেডিও থেকে। সে প্রায়ই বলত—মফস্বলে কিছু হয় না, শিখতে হলে যেতে হবে কলকাতা। হাসির মন বলতে থাকে—কলকাতা, কলকাতা। তুমি গান গাও? নাচো? কবিতা লেখো? তুমি চাকরি চাও? উন্নতি চাও? তোমার মরাণাপন্ন অসুখ! তবে কলকাতা যাও। যাও কলকাতায়। একবার কলকাতা থেকে ঘুরে এস। মানুষকে কলকাতা সব দিতে পারে।

খ্যাতি, টাকা, প্রাণ পর্যন্ত। কলকাতা থেকে যারা শিলচরে ফিরে যায় সেই সব বন্ধুদের কাছ ঘেঁসে কলেজে বসত হাসি। দেখত—ঠিক। ওদের মুখে-চোখে আলাদা দীপ্তি, ঝলমলে আনন্দিত ওদের পোশাক, গায়ে কলকাতার মিষ্টি গন্ধ। মাসীকে বলত—মেসোকে বলত—কী গো তোমরা! ভারী ঘরকুনো, চল একবার কলকাতা যাই। মাসী মেসো সমস্বরে বলত—সে ভারী দূরের রাস্তা, পথের কষ্ট খুব, একগাদা টাকা খরচ, তা সেখানে গিয়েই বা হবে কী? যা ভীড়, গণ্ডগোল, মারপিট—আমাদের মত সুন্দর নিরিবিলি শহর নাকি সেটা? চোর পকেটমার, রকবাজ ছেলে, রাজনীতি—দূর দূর—

যাওয়া হত না। হত না বলেই হাসির কল্পনায় কলকাতা ক্রমে ক্রমে এক বিশাল ব্যাপক রাজত্ব স্থাপন করে। কলকাতায় যেন বা আলাদা সূর্য ওঠে, আলাদা চাঁদ, কলকাতা শূন্যে ভাসমান বুঝি বা। কলকাতাকে ঘিরে যে সব কল্পনা হাসির—সে সব কল্পনা কলকাতার দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলের মত তার ভিতরটা তছনছ করে দিয়ে যেত। কলকাতা কল্পনা-লতা তার ওপর দুচোখের পল্লবের ছায়া ফেলেছিল। কলকাতা বলে বোধহয় কিছু নেই তবে। লোকে কেউ কখনো যায় নি। সবাই মিলে যোগাযোগ করে বানিয়েছে গল্প। যারা কলকাতার কথা জানে তারা নিজেদের মধ্যে চোখ-টেপাটেপি করে, কানাকানি করে, যুক্তি করে, হাসিকে এক কাল্পনিক শহরের কথা শোনায়। কলকাতার খণ্ডিত ছবি সে অনেক দেখেছে ভূগোলের বইতে, খবরের কাগজে, ক্যালেণ্ডারে। কখনো জি-পি-ও-র ঘড়ি, হাওড়া ব্রীজ, ভিক্টোরিয়া, মনুমেণ্ট, তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ক্রমে সে বুঝতে পারে, কলকাতার দৃশ্য নয়, রাস্তা ঘাট আলো নয়; নয় তার দোকানপাট কিংবা বিচিত্র পসরা—এ সবের অতীত, কিংবা এসব মিলিয়ে, কলকাতা এক মন্ত্রের মত। কিংবা কলকাতা কি জ্বলন্ত পুরুষ, তার বুকে রহস্যের শেষ নেই, সীমাহীন তার নিষ্ঠুর উদাসীনতা, চুম্বকের মত তার আকর্ষণ! দূর দূরান্ত থেকে' প্রেমিকারা চলেছে

কলকাতার দিকে। কেবলই চলেছে!

কলকাতা এক প্রেমিকেরই নাম। জ্বলন্ত দুর্বার এক প্রেমিক পুরুষ। কলকাতায় একবার গেলে আমি আর ফিরব না, ভাবত হাসি।

হাসি লেখাপড়া শিখত কলকাতায় যাবে বলে। গান শিখত, নাচ শিখত—কলকাতায় যেতে হলে কোনটা যে দরকার হবে, কোনটার সূত্রে কলকাতায় যাওয়া হবে তা বুঝতে পারত না। কিন্তু হাস্যকর হলেও এ কথা খুবই সত্য যে তার সব কিছুর পিছনেই ছিল কলকাতা, কলকাতা। বিয়ের সম্বন্ধ মাসীই খুঁজছিল। হাসি একদিন খুব লজ্জার সঙ্গে তাকে বলে—যদি বিয়ে দাও তো কলকাতায় দিও। মাসী অরাজী ছিল না। কিন্তু অত দূরের পাল্লায় ঠিকমত যোগাযোগ কে করে!

সেই সময়ে ডিগবয়ের তেল কোম্পানীর এক এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে চমৎকার সম্বন্ধ এসে গেল হাসির। বিলেত-ফেরত ছেলে, বেশ স্মার্ট চেহারা, দেড় দুই হাজার মাইনে। হাসিকে পাত্রপক্ষ পছন্দও করে গেল। মণিপুরী নাচে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শিলচরে তখন হাসির বেশ নাম। রঙ চাপা হলেও বড় সুশ্রী ছিল হাসি। সবাই জানত হাসির ভালই বিয়ে হবে। হয়েও যাচ্ছিল। পাত্রের ঠাকুমা মারা গিয়েছিল মাস আষ্টেক আগে, চারমাস পর কালাশৌচ কাটবে। তখন অস্থি বিসর্জন দিয়ে বিয়ে হবে—ঠিক হয়েছিল। হয়ে গেল পাটিপত্র, এমন কি আশীর্বাদের ব্যাপারে কালাশৌচ ওঁরা মানেননি। হাতে তখন চারমাস সময়। মাসীর অ্যালবামে পাত্রের ফটো সাঁটা হয়ে গেছে, পাশে হাসির ফটো। মাসী মাঝে মাঝে হাসিকে অ্যালবামের সেই পাতাটা খুলে দেখাত—দ্যাখ হাসি!

হাসির মন বলত—কলকাতা, কলকাতা বহু দূরে এক বিশাল পর্বতের মতো বহ্নিমান পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্দিককে কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণে টানছে চুম্বক পাহাড়ের মত। সেখানে গেলে ফিরত না হাসি। যাওয়া হবে না কি!

কাছাড়ের এক লোকনাট্য দল সেবার কলকাতায় যাচ্ছে। তারা হাসিকে দলে নিতে রাজী। হাসি মাসীকে গিয়ে ধরল—এখনো চারমাস বাকী। একবার ঘুরে আসি মাসী। মাত্র তো পনেরোটা দিন।

—বিয়ের আগে কলকাতায় গিয়ে নাচবি গাইবি, সেটা কি ভাল দেখাবে? পাত্রপক্ষ যদি কিছু মনে করে!

হাসি হাসে—কলকাতার জলে রঙ ফর্সা হয়, জানো না?

অনেক বলা-কওয়ায় মাসী রাজী হল।

কলকাতা কীরকম দেখতে, তা আজও হাসি সঠিক জানে না। প্রথম দিনের মতই। বহুদূর থেকে একটা যৌবনকালের প্রতীক্ষা নিয়ে সে যখন কলকাতায় নামল তখন আর রাস্তার কষ্টের কথা মনেও ছিল না, খুব পিপাসা পেয়েছিল, বিবেকানন্দ ব্রীজ পেরিয়ে আসার সময়ে যে গুম গুম আওয়াজ করেছিল রেলগাড়ি, সেই আওয়াজ শিয়ালদা পর্যন্ত তার বুকের ভিতরে কলকাতার শব্দতরঙ্গ তুলেছিল। শিয়ালদার ঘিঞ্জি কলকাতা সে তো চোখে দেখেনি। শুভদৃষ্টির সময়ে কেউকি বরের মুখ ঠিকঠাক দেখতে পায়, নির্লজ্জ ছাড়া? সে গাড়ি থেকে প্লাটফর্মে পা দিতেই এক দুরন্ত পুরুষের প্রকাণ্ড উষ্ণ বুকের মধ্যে চলে এল। গর্জমান এক কামুক পুরুষ যার শিরা-উপশিরায় প্রাণস্রোত, যার আদরে অবহেলায় সর্বক্ষণ জীবন বয়ে যাচ্ছে। সেই প্রথম পুরুষটির আদরে লজ্জায় চোখ বুজেছিল বুঝি হাসি। চোখ আর খোলা হল না। কলকাতা তার চারদিকে সর্বক্ষণ এক শিশুবয়সের বিস্মৃত রঙীন মেলার মত কাল্পনিক হয়ে রইল।

জ্যাঠতুতো দিদির বাড়িতে উঠেছিল হাসি, চিৎপুরের এক ফ্ল্যাট-বাড়িতে। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে সে একদিন লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানও করল। কিন্তু সারাক্ষণ সে কেবলই তার শিরায় শিরায় উল্লসিত রক্তের স্পন্দনে কলকাতার শব্দ শুনল। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে টের পেল তার যুবতী বুক কলকাতার পাথুরে বুকের সঙ্গে মিশে

আছে। একের হৃৎস্পন্দন মিশে যাচ্ছে আর একজনের সঙ্গে। আমি তোমাকে ছেড়ে কী করে আবার ফিরে যাব—মনে মনে বলত হাসি।

পাশের ফ্ল্যাটে এক দম্পতি ছিলেন, আর ছিল অমিয়। দম্পতি অমিয়রই দিদি জামাইবাবু। এ ফ্ল্যাটে হাসিরও দিদি জামাইবাবু। দুই পরিবারে যাতায়াত ছিল। সামনের বারান্দাটা কমন। সেইখানে দাঁড়িয়ে কলকাতা দেখতে দেখতে হাসি কতদিন দেখেছে পাশের ফ্ল্যাট থেকে সুন্দর পোশাক পরে অমিয় বেরোচ্ছে, নীচে রাস্তায় রাখা তার স্কুটার। স্কুটারে চলে যেত ছেলেটা, যাওয়ার আগে তাকে লক্ষ্য করত। কিন্তু অমিয়কে কেন লক্ষ্য করবে হাসি? কলকাতার প্রেমিকা কেন গ্রাহ্য করবে অন্য পুরুষকে?

দুই পক্ষের দিদি জামাইবাবুরা প্রায় রাতেই খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ফিস খেলার আসর বসাতেন। হাসি থাকত, অমিয়ও। দুপক্ষের কথাবার্তা মাঝে মাঝে হাসি আর অমিয়কে ঘেঁষে যেত। সে সব ঠাট্টার গুরুত্ব ছিল না। হাসির দিদি জামাইবাবু জানতেন হাসির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

হাসি অমিয়কে তেমন করে লক্ষ্য করত না ঠিকই, কিন্তু তার মন বলত—কলকাতা, কলকাতা।

অমিয় খুব বেশীমাত্রায় লক্ষ্য করেছিল হাসিকে। কতটা তা হাসি টের পায়নি। কিন্তু একদিন অমিয় খুব দুঃসাহসের সঙ্গে প্রস্তাব করেছিল—চলুন, আমার স্কুটারে আপনাকে কলকাতা দেখিয়ে আনি। প্রথমদিন হাসি রাজী হয়নি। কিন্তু কয়েকদিন পরে হয়েছিল। কলকাতার মেয়াদ তখন শেষ হয়ে এসেছে। কয়েকদিন পরই হাসি চলে যাবে।

মসৃণ, সুন্দর ক্যাথিড্রাল রোড হয়ে ময়দানের দিকে স্কুটার ছুটিয়ে অমিয় প্রস্তাব দিয়েছিল—যদি কিছু মনে না করেন—

কলকাতা—কেবলমাত্র কলকাতার জন্য হাসি থেকে গেল।

টকয়েকা কাগজপত্রে সই করে বিয়ে, বাড়িতে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানানো তারপরই ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাট।

হাসির মন বলত—কলকাতা কলকাতা!

হাসির জীবনে অমিয় কোথাও ছিল না। যৌবনকালে একশো ছেলে ভালবেসেছে হাসিকে। শিলচর জুড়ে ছিল তার প্রেমিকেরা। তাদের মধ্যে ছিল আসামের রঞ্জি ট্রফির ক্রিকেট খেলোয়াড়, কবি, অধ্যাপক, ছাত্রনেতা, ভবঘুরে। তাদের অনেকের সঙ্গে হাসির দীর্ঘ-কালের সম্পর্ক। কোথায় ছিল অমিয়! পাত্র হিসেবেও অমিয় তো কিছুই না। সত্ত ব্যবসা শুরু করেছে! কয়েকটা অর্ডারে লাভ পেয়ে কিনেছে স্কুটার, দুহাতে টাকা ওড়ায়, পোশাক কেনে। সেই অমিয় হাসির জীবনে এসে গেল! এসে গেল, আবার এলও না। সারাদিন টাটা-বিড়লা হওয়ার আশায় সারা কলকাতা দৌড়-ঝাঁপ করে যখন অমিয় ফিরত, তখন সদর খুলে অমিয়কে দেখে একটু অবাক হয়ে এক পলকের জন্য হাসি ভাবত—আরে এ লোকটা কে? স্বামী? তার মনে পড়ত, সারাদিন সে অমিয়র কথা ভাবেইনি!

শরীরে শরীরে কথা হত ঠিকই। অমিয়র প্রথম দিকের ভালবাসা ছিল তীব্র, শরীরময়, আক্রমণাত্মক। হাসি সেই খেলায় আগ্রহভরে অংশ নিয়েছে। কিন্তু সে কতটুকু সময়ের ভালবাসা? শরীর জুড়োলেই তা ফুরোয়। তারপর আর আগ্রহ থাকে না অচেনা পুরুষটির প্রতি। হাসি তখন থেকে নিষ্ঠুর।

চিৎপুরের দিদি-জামাইবাবু এসে বলতেন—হাসি, তোমার বাবা-মা আমাদের দোষ দিয়ে চিঠি লিখেছেন, আমরা কী লিখব ওদের?

—দোষ! আপনাদের দোষ কী?

—দোষ নেই ঠিকই, তুমি ভালবেসে বিয়ে করেছ, কিন্তু আমাদের বাসায় থেকেই তো ব্যাপারটা ঘটল!

ভালবাসা! হাসি ভারী অবাক হত। ভালবাসা কিসের!

কাকে! অমিয়কে? অমিয়কে তো সে কোনকালে ভালবাসেনি। সে ভালবেসেছিল কলকাতাকে। বিশাল কলকাতার কতটুকু প্রতিদ্বন্দ্বী অমিয়? অমিয়কে জানালায় এসে বসা চড়াইপাখীর মত তুচ্ছ মনে হত তার। যার সঙ্গে হাসির বিয়ে ঠিক হয়েছিল, বা তার শিলচরের অন্য প্রেমিকেরা—তাদের তুলনাতেও অমিয় কিছুই না। কিছুই না। অমিয় কেবল কোলকাতায় হাসিকে আশ্রয় দিয়েছে।

বিয়ের ছ'মাস পরে মাসী আর মেসোমশাই এসেছিলেন।

—এটা কী করলি হাসি? সেই ডিগবয়ের ছেলেটা বিয়েই করল না।

হাসি উত্তর দেয়, আমি যা চেয়েছিলাম, পেয়েছি।

—কী চেয়েছিলি?

হাসি মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল—কলকাতা।

তিন বছরে ডাকটিকিটটা ভিজে ভিজে আলগা হয়ে এসেছে। খামের গা থেকে এবার সাবধানে তুলে নেবে হাসি, একটা চৌকো দাগ থেকে যাবে কি? থাক। শরীর বহতা নদীর মত, শরীরে কোন চিহ্ন থাকে না। অমিয়কে শরীরের বেশী দেয়নি হাসি।

সিলিংফ্যানের ঝকঝকে ইস্পাতের রঙের ঘূর্ণী বৃত্তটা দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল হাসি। উঠে দেখল রোদের মুখে বসেছে কালো মেঘ। গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে। পূবের বাতাসে পর্দা উড়ে আসছে। উদ্ভিদহীন কলকাতায় প্রকৃতির বন্য গন্ধ নিয়ে আসে বৃষ্টি।

পাশ ফিরতেই খুব অবাক হয়ে হাসি দেখে, শতরঞ্চির একধারে তার মাথার কাছেই একটা ছোট্ট লালচে ইঁদুর মরে পড়ে আছে। শিশু শরীর ইঁদুরটার, উদোম ন্যাংটো, মুখে নির্দোষ একখানা ভাব, চুপ করে মরে গেছে কখন। আহা রে! এত দূর এসেছিলি কেন? কিছু বলতে চেয়েছিলি আমাকে? লাল টুকটুকে হাত-পা, সুন্দর সতেজ লেজ, রেশমের মত রোমরাজি, ঠোঁটে গোঁফের নরম সাদাটে

ফুল। আস্তে আস্তে উঠে বসে হাসি। তার একটু কষ্ট হয়। বিষ সে নিজে মিশিয়েছিল।

উঠে মধুকে ডাকে হাসি—ঘরগুলো খুঁজে দেখ মধু, ইঁদুরগুলো কোথায় কোথায় মরে পড়ে আছে। পচে গন্ধ বেরোবে।

চারটে বেজে গেছে। জামাইবাবুকে একটা ফোন করা দরকার। রিজার্ভেশনটা যদি পাওয়া যায়!

জলে কলকাতার ভঙ্গুর প্রতিবিম্ব পড়েছে, ভেঙে যাচ্ছে। জল হলে এক কলকাতা অনেক কলকাতা হয়ে যায়। গোলপার্ক থেকে বাস ধরে হাসি গড়িয়াহাটায় এসে পেট্রোল পাম্প থেকে জামাইবাবুর অফিসে টেলিফোন করে।

—জামাইবাবু, আমি হাসি।

—বল।

—আমার রিজার্ভেশনের কী হল?

—হয়নি। দার্জিলিং মেলে ভীষণ ভীড় হচ্ছে। এখন সামার-রাশ।

—রেলে যে কে আপনার বন্ধু আছে চেকার!

—থাকলেই বা, সিটি বুকিংগুলো দেখে এস না! তিনদিন ধরে লাইন দিয়ে বসে আছে লোক—কোথায় কত টিকিটের কোটা আছে সব তাদের মুখস্থ, একটা টিকিট কম পড়লে আস্ত রাখবে?

—এত লোক যাচ্ছে কোথায়?

—কলকাতা থেকে পালাচ্ছে; আবার কলকাতায় পালিয়ে আসবে বলে।

—আমার মনে হয়, আপনি গা করছেন না।

—তা তো করছিই না।

—কেন?

—তুমি সুখের পাখী উড়ে যাবে, আর আমরা পড়ে থাকব হাঁফিয়ে

ওঠা ভ্যাপসা কলকাতায়—তা কি হয়!

—আমার যে যাওয়াটা দরকার।

—কেন?

—যাব না কেন?

ওপাশে জামাইবাবু একটা শ্বাস ফেলে।

—হাসি, গতকাল অমিয় আমার কাছে এসেছিল।

হাসি তীক্ষ্ণ গলায় বলে—কেন?

—ভয় পেও না। সে তোমার চলে যাওয়া আটকানোর ষড়যন্ত্র করতে আসে নি।

হাসি চুপ করে থাকে।

—ও এসেছিল একটা ষ্টীমারঘাটের কথা বলতে।

স্টীমারঘাট!

—ষ্টীমারঘাট। ও আজকাল মাঝে মাঝে একটা স্টীমারঘাট দেখতে পায়।

—তার মানে?

—তার মানে তোমাকেই আমরা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।

স্টীমারঘাটের কথা আমি কী জানি। কোথাকার স্টীমারঘাট।

—তার আগে বল, ওর ব্যবসার অবস্থা কী?

হাসি একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে—বোধহয় ভাল না। বাজারে অনেক ধার জমে গেছে।

—আর এ সময়ে তুমি সুখের পাখী উড়ে যাচ্ছ?

—আমি কী করব জামাইবাবু?

ওপাশে জামাইবাবু আবার চুপ।

—আমার রিজার্ভেশনের কী করবেন বলুন? কাছে-পিঠের রাস্তা হলে আমি রিজার্ভেশন ছাড়াই চলে যেতাম। কিন্তু চারদিন ধরে যাওয়া তো সে ভাবে সম্ভব না।

—দেখছি।

—আমার কিন্তু সময় নেই। আর পনেরো দিনের মাথায় খুশীর বিয়ে। তারপর ফিরে এসে স্কুলে জয়েন করব। বুঝলেন?

—বুঝেছি। কিন্তু অমিয়র স্টীমারঘাটের কী হবে?

—আমি কী জানি।

—হাসি, অমিয়র ওজন কত?

হাসি হেসে ফেলে। বলে—আমি কি দাঁড়িপাল্লা?

—না। কিন্তু বৌরা তো স্বামীর ওজন জানে। জানা উচিত।

—ফোন রেখে দেব কিন্তু।

—আমি ইয়ার্কি করছি না। অমিয়কে দেখে মনে হয় অন্ততঃ কুড়ি কে.জি.ওজন কমে গেছে।

হাসি একটা শ্বাস ফেলে। অমিয় বোধহয় তাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু তাতে হাসির কিছু যায় আসে না।

—জামাইবাবু, আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করি নি। আমাদের মধ্যে কোন ভুল-বোঝাবুঝি নেই।

—তোমার দিদির সঙ্গে আমার রোজ চারবার করে ঝগড়া হয়, আর ভুল বোঝাবুঝি? আমরা জীবনে কেউ কাউকে বুঝব না। কিন্তু গত চারমাসেও আমার ওজন দুই কে. জি বেড়েছে।

—ওজনের কথা বলছি না।

—আমি ওজনের পয়েন্টেই স্টিক্ করতে চাই। হাসি, অমিয়র ওজন কমে যাচ্ছে কেন?

—আমার রিজার্ভেশনের কথাটা মনে রাখবেন। ছেড়ে দিচ্ছি—

—ছেড়ো না। শোন, স্টীমারঘাটের কথা ও তোমাকে কখনো বলে নি?

—না।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্যের কি? ও আমাকে অনেক কথাই বলে না।

—কিন্তু স্টীমারঘাটের ব্যাপারটা বলা উচিত ছিল।

—কেন ?

—স্টীমারঘাটটা ও খুব স্পষ্ট দেখতে পায়, আর এমন ভাবে বলে যে আমিও যেন সেটা দেখতে পাই। শুনতে শুনতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল।

—কী রকম স্টীমারঘাট সেটা ?

—খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ি বহুদূর গড়িয়ে নেমে গেছে···কিন্তু ফোনে অত সব বলা যায় না। তুমি ওর কাছে শুনো।

—আমি শুনব কেন জামাইবাবু ? আমার কৌতূহল নেই।

—তুমি আসাম থেকে কবে ফিরবে হাসি ?

—বললাম তো, খুশীর বিয়ে হয়ে গেলেই। ফিরে এসে স্কুলে জয়েন করব।

—সেটা তো ফেরা নয়। স্কুলে মানে বাগনানের কাছে যাবে, গ্রামে। কিন্তু তুমি অমিয়র কাছে কবে ফিরবে হাসি ?

হাসি উত্তর দেয় না। ফোনটা খুব আস্তে ক্রাডলে নামিয়ে রাখে।

আজ কলকাতা বৃষ্টির পর বড় সুন্দর সেজেছে। সূর্যের শেষ আলো সিঁদুর-গোলা রঙ ঢেলেছে রাস্তায় রাস্তায়। গড়িয়াহাটার বাড়িগুলোর গায়ে সেই অপার্থিব রঙ। জলে ছায়াছবি। রাস্তা-গুলো ভেজা, রাস্তার নীচু অংশে পাতলা জলের স্তর জমে আছে। সেই জল থেকে আলোর অজস্র প্রতিবিম্ব উঠে আসে। একা একা হাঁটতে বড় ভাল লাগছে হাসির। মোড়ের দোকানগুলোর শো-কেসে সে সুন্দর শাড়ীগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল একটু। পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল। কি ভীড় চারদিকে! তবু এ ভীড় বড় রঙীন। বাগনান থেকে হয়তো প্রায়ই আসা হবে না, কিন্তু পুরোনো ভালোবাসার টানে ছুটি-ছাটায় ঠিক চলে আসবে হাসি, উঠবে চিৎপুরে দিদিজামাই -বাবুর কাছে। একা একা ঘুরবে কলকাতায় যেমন সে গত তিনবছর ধরে ঘুরেছে এবং ক্লান্ত হয়নি। কলকাতার রূপ কখনো ফুরোয় না।

একটা মরা বেরাল পড়ে আছে বৃষ্টিতে কাদায় মাখামাখি হয়ে। ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামতে বেরালটাকে ডিঙিয়ে গেল হাসি। পচা গন্ধ, কাছেই বসে কোন নেমন্তন্ন-বাড়ির এঁটো-কাটার রাশ খবরের কাগজে জড় করে বসেছে এক ভিখিরি মেয়ে তার বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে। হাসি ট্রামলাইন পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। তার মন বলে, আজও বলে—কলকাতা, কলকাতা।
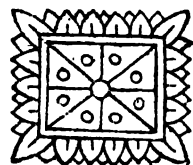
চলে যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল অমিয়, ঠিক সে সময়ে নিঃশব্দ পায়ে কালীচরণ এল। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ হয়নি। অমিয় একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

—চলে যাচ্ছিলেন? কালীচরণ জিজ্ঞেস করে। তার মুখে ঘাম, উৎকণ্ঠা।

—হুঁ।

—আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম।

অমিয় চুপ করে থাকে।

—গত দুমাস কিছু চাইনি। জানতাম আপনি অসুবিধেয় আছেন। কিন্তু এখন আমার বড় ঠেকা। পেমেণ্টের একটা তারিখ দিন এবার।

অমিয় জিজ্ঞেস করে—সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ হয়নি কেন কালীচরণ?

কালীচরণ একটু থমকে যায়। চেয়ে থাকে। অমিয় হাত বাড়িয়ে ওর ঘেমো হাতখানা ছুঁয়ে বলে—কাঠের সিঁড়িটা বড্ড পুরনো হয়েছে, বেরাল বাইলেও শব্দ হয়। তুমি কি করে শব্দ না করে উঠলে? তুমি বেঁচে আছ তো! ভুত হয়ে আসনি তো কালীচরণ? কিংবা পাখায় ভর করে?

কালীচরণ একটু হেসে একটা ময়লা রুমালে মুখ মোছে। তার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হার্ডওয়ার বাজার যদিও কালীচরণের পায়ের তলায়, কিন্তু তবু বাইরের চেহারায় সে ভদ্রলোক থাকেনি। ময়লা মোটা ধুতি, গায়ে লংক্লথের হাফ-হাতা জামা, পায়ে টায়ারের চটি।

—বাগচীবাবু, আমার মেয়ের বিয়ে। তিনহাজার যদি আপনার কাছে আটকে থাকে তো আমি গরিব, কী দিয়ে কী করব?

অমিয় একটু চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে—দুটো সরকারী অর্ডার আছে কালীচরণ, পনের হাজার টাকার। করবে?

—আপনি পেয়েছেন?

অমিয় মাথা নাড়ে—আমারই। কিন্তু আমি করব না। তুমি করো তো তোমাকেই ছেড়ে দিই।

কালীচরণ সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে— আপনি কত পারসেন্ট নেবেন?

—এক পয়সাও না। শুধু পেমেন্টের জন্য আমাকে একটু সময় দাও।

—অর্ডার দেখি—বলে কালীচরণ হাত বাড়ায়।

অমিয় অর্ডারের কাগজপত্র বার করে দেয়।

কালীচরণ কয়েক পলক অর্ডারের কাগজপত্র দেখে বলে—মাত্র আট পারসেন্ট উঁচু দর দিয়েছেন! তাও হচ্ছে একমাস দেড়মাস আগেকার দর। গত একমাসে মেরিন পার্টস, কয়েল আর স্প্রীংয়ের দর দশ থেকে কুড়ি পারসেন্ট বেড়েছে। পনেরো হাজার টাকার

অর্ডার, অফিসার আর বিল ডিপার্টমেন্টকে খাইয়ে হাজারখানেকও ঘরে তোলা যাবে না। পরিশ্রম পোষায়?

—তুমি করবে না?

কালীচরণ একটু হাসে—করব না কেন? ব্যবসা চালু রাখতে হলে কাজ ধরতেই হবে, লোকসান হলেও।

গায়ের জামা খুলে স্যাণ্ডো গেঞ্জী গায়ে রজত টেবিলের ওপর শুয়ে ছিল। তার রায়চৌধুরী এখনো আসেনি। শুয়ে থেকেই মুখ ফিরিয়ে বলল—কালীচরণ, বাগচীর জায়গায় আমি হলে অর্ডার ছুটো কেড়ে নিয়ে তোমাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতাম।

—কেন?

—সরকারী অর্ডারের জন্য হাজারটা লোক হন্যে হয়ে ঘুরছে। তুমি ভদ্রলোক হলে লোকসানের কথা বলতে না। পনেরো হাজারে তোমার অন্তত ছ'হাজার মার্জিন থাকবে।

কালীচরণ বিড় বিড় করে বলে— দেনা-পাওনার কথা উঠলেই সব জায়গায় খিচাং—

রজত ধমক দিয়ে বলে—দেনা-পাওনা আবার কী? বাগচীর তিন হাজার ঐ অর্ডারে শোধ হয়ে গেল। আর এসো না।

—তার ম্যানে? তিন হাজার টাকা আমি এখনো পাই—

—না পাও না। তোমাকে সেনগুপ্ত এনেছিল, তার আমলে তুমি সাপ্লায়ার ছিলে। পারো তো তাকে খুঁজে বের করো।

—তাকে পাব কোথায়!

বাগচী তার কী জানে কালীচরণ? ছোট কোম্পানী, আট-দশ হাজার টাকা ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল, আর লায়াবিলিটি সব রেখে গেল—এটা কি মগের মুল্লুক?

—আমি তার কী জানি!

—তোমাদের সঙ্গে সেনগুপ্তর ষাট আছে, আমি জানি। সে-ই তোমাদের পাঠাচ্ছে তাগাদায়। যাতে বাগচী বিপদে পড়ে। বাগচী

ভাল লোক কালীচরণ, দেনা সে সব মেনে নিচ্ছে, সরকারী অর্ডার বিলিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মনে রেখো গড়বড় করলে ঝামেলা হবে।

কালীচরণ চুপ করে থাকে।

রজত হাই তুলে বলে—সকলের দিন সমান যায় না। বাগচী তোমাদের অনেক বিজনেস দিয়েছে। এখনও বেরোও—

কেউ তার হয়ে বোঝাপড়া করুক, কিংবা তাকে করুণা করুক, এটা আজও পছন্দ করে না অমিয়। সেইটুকু অহঙ্কার তার এখনো আছে। তবু সে কিছুই বলে না। চেয়ে থাকে।

দুর্বল চোখে একটু চেয়ে থেকে কালীচরণ উঠে পড়ে।

শ্লথ ভঙ্গীতে টেবিল থেকে রজত তার চেয়ারে নেমে বসে। অলস ভঙ্গীতে বুশ-শার্টটা চেয়ারের পিঠ থেকে খুলে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে অমিয়র দিকে তাকায়। চোখে ভর্ৎসনা।

কেমন লজ্জা করে অমিয়র। চোখ সরিয়ে নেয়। অর্ডার দুটো রাখবার জন্য তাকে অনেকবার কল্যাণ বলেছিল। তিন চার মাস কোন অর্ডার পায়নি অমিয়, এই দুটো পাওয়াতে দিন সাতেক আগে তারা তিনজন অফিসঘরে একটা ছোট্ট উৎসব করেছিল। সবীর থেকে রেজালা আর তন্দুরী রুটি এসেছিল, আর কে-সি দাশের সন্দেশ। কল্যাণ মুখার্জী, রজত সেন আর অমিয় বাগচী—তারা কেউ কারো বন্ধু নয়। একটা ঘরে তিনটে টেবিলে তাদের তিনটে আলাদা কোম্পানী। যে যার ব্যবসার ধান্দায় ঘোরে। রোজ দেখাও হয় না। কিংবা খুব কম সময়ের জন্য দেখা হয়। তবু কি করে যেন তাদের মধ্যে বুনো মোষের মত পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা এসে গেছে। তারা কেউ কখনো তিনটে কোম্পানীকে এক করার কথা বলেনি। তারা বন্ধুও নয়। তাহলে কী? তা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু বাগচীর কিছু হলে আপনা থেকেই রুখে দাঁড়ায় মুখার্জী আর সেন, যেমন সেনের কিছু হলে রুখে ওঠে বাগচী আর মুখার্জী। বোধহয় এই ঘরটাই তাদের এই সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে।

সেনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অমিয় মাথা নীচু করে ছিল।

রজত ইণ্ডিয়া কিংসের প্যাকেটটা ছুঁড়ে দেয় অমিয়র টেবিলে। বলে—আপনার ঠোঁটে সন্দেশের গুঁড়ো লেগে আছে বাগচী, মুছে নিন।

অমিয় একটু হাসে। সহজ হতে চেষ্টা করে। বলে—আমার দ্বারা সাপ্লাইটা হত না সেন।

রজত ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকিয়ে থেকে বলে—গত তিন মাস অপনি বিজনেস পাননি বাগচী। এই অর্ডারটা ছাড়তে আপনাকে আমরা বারণ করেছিলাম।

—আমি পারতাম না।

—আমরা চালিয়ে দিতাম। আফটার অল্ উই আর কমরেডস।

রজত ওঠে। তার ডেস্ক, আলমারী বন্ধ করতে করতে হঠাৎ একটু হেসে বলে—জার্মানী থেকে আপনাকে কী পাঠাব বলুন তো! ঘড়ি? শেভার? নাকি কলম? তার চেয়ে জব ভাউচার একটা পাঠিয়ে দেব বরং—কী বলেন?

রজত নিজেই হাসে—কিন্তু মিসেসকে রেখে আপনি তো যাবেন না। গিয়েও শান্তি পাবেন না। ম্যারেডদের ঐ এক বিপদ।

সে কথার উত্তর না দিয়ে অমিয় তার গভীর অন্যমনস্ক মুখ তুলে বলে—সেন, লক্ষ্য করেছেন কালীচরণের পায়ের কোন শব্দ হয় না!

—কী বলছেন? রজত ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

—বলছি, যাদের পায়ের শব্দ হয় না তারা খুব ডেঞ্জারাস। সেনগুপ্তরও হত না।

সেনগুপ্তর উল্লেখে রজতের মুখটা ঝুলে পড়ে। চাপা গলায় সে বলে—বাস্টার্ড। আপনাকে কি সেনগুপ্ত হিপনোটাইজ করেছিল বাগচী? কী করে তবে সে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকা তুলে নিল,

আদায় করে নিল চার চারটে বিল-পেমেণ্ট, সমস্ত লায়াবিলিটি কী করে আপনার ঘাড়ে ফেলে গেল?

অমিয় একবার হাত উল্টে তার অসহায়তা প্রকাশ করে মাত্র। কথা বলে না। হতাশ গলায় রজত বলে—ব্যবসা আপনার কর্ম নয় বাগচী। আপনি ভীতু হয়ে যাচ্ছেন লোককে দাবড়াতে পারেন না।

সেনগুপ্তর পায়ের কোন শব্দ হত না—এই সত্যটা আবিষ্কার করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অমিয়। কালো ছিপছিপে সুপুরুষ এবং হিংস্র সেনগুপ্ত ছিল বার্ড কোম্পানীর চাকরে। চাকরি নামে মাত্র, সে ছিল কোম্পানীর টিমের নাম-করা গোলকীপার। খেলার জন্যই চাকরি পেয়েছিল। পোস্ট থেকে পোস্টে উড়ে শট আটকাত, বহুবার পেনালটি ধরেছে। অবধারিত একটা লিফট্ পেত, কিন্তু সেবার হাঁটুর মালাইচাকী ভেঙে পড়ে রইল ছ'মাস। উন্নতির আর আশা নেই দেখে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে এল অমিয়র সঙ্গে।

তখন অমিয় মারাত্মক পোশাক পরত, দারুণ হাসত, পীচের রাস্তার মত গড়গড়ে ইংরিজি বলত। সাপের মত সাবলীল ছিল তার নড়াচড়া, ক্রুর চোখ, ঘন ভ্রূ। সেনগুপ্ত তার দিকে সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকত। একটা সময় ছিল যখন সেনগুপ্তর মত বিপজ্জনক ছেলেকে নিপুণভাবে চালাত অমিয়। তখন সাপ্লায়ারেরা সাবধানে মাল দিত, ছমাস ন'মাস তাগাদা করত না। অর্ডার আসত ঝাঁকে ঝাঁকে। চোখা, চালাক, সাহসী অমিয় হিংস্র মারকুট্টা সেনগুপ্তকে ব্যবহার করত ব্যবসার ডেকর হিসেবে, কখনো তাকে বানাত দেহরক্ষী, কখনো তাকে আউটডোরে ঘুরিয়ে আনত সেলস্‌ম্যান হিসেবে। সেনগুপ্তকে তৈরি করেছিল সে-ই। তারপর কবে থেকে—কবে থেকে যেন—বহু দূরের এক অচেনা নির্জন ফেরীঘাট জাহাজের মত ধীরে অমিয়ের কাছাকাছি চলে আসতে থাকে। তখন থেকেই সে মাঝে মাঝে সেনগুপ্তর দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে চমকে উঠত। সে দেখতে পেত—তার সামনে স্বাভাবিক পোশাক পরা সেনগুপ্ত নয়—সেনগুপ্তর

পরনে কালো শর্টস্, লাল টুকটুকে গেঞ্জী, দস্তানা পরা হুটো হাত থাবার মত উদ্যত হয়ে আছে, মাথায় টুপি, টুপির ছায়ায় দুটো আলপিনের মত চোখ, ফণা তুলে দুলছে এক হিংস্র গোলকীপার, অমিয়র সব রাস্তা বন্ধ করে সে দাঁড়িয়ে।

মানুষের পতনের কোন শব্দ হয় না। তবু আশপাশের কিছু লোক ঠিক কেমন করে টের পায়, এ লোকটার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কোনদিন দীর্ঘ টেণ্ডার টাইপ করতে করতে হঠাৎ চোখ তুলে সেনগুপ্ত হয়তো দেখেছিল, অমিয় ভীত চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। কিংবা হয়তো কোনদিন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে দুজনে বেরোনোর সময় অন্ধকার সিঁড়িতে সেনগুপ্তর আগে আগে নামতে দ্বিধা করেছে। কিংবা এরকমই কোন তুচ্ছ কিছু লক্ষণ দেখেছিল সেনগুপ্ত। বুঝেছিল ব্যবসাতে অমিয়র দিন শেষ, তার শুরু। বুঝেছিল সাপ্লায়াররা, পারচেজাররা। বুঝেছিল আরো অনেকে। সবার শেষে বুঝেছে অমিয়। স্পষ্টই নিজের ভেতরে সে এখন এক দিনাবসান টের পায়, প্রত্যক্ষ করে সূর্যাস্ত। বহু দূর থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে এক নির্জন ফেরীঘাট, তার জেটি, তার অতলান্ত জল···অমিয় মুখ তোলে

—কিছু বলছেন সেন ?

—একটা মেয়েকে কী করে রিফিউজ করতে হয় বাগচী ? আমি কোন ল্যাংগুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। নাকি জার্মানীতে গিয়ে চিঠি দেব ?

অমিয় একটু হাসে—ল্যাংগুয়েজের দরকার হয় না সেন। রিফিউজ্যাল মনে থাকলেও লোকে ঠিক বুঝে নেয়। ডোণ্ট বদার।

—মাইরি ! তাহলে বেঁচে যাই।

অমিয় হাসে।

—চলি বাগচী। সিগারেটের প্যাকেটটা আপনি রেখে দিন। যদি রায়চৌধুরী আমার মোটর পার্টস্ নিয়ে আসে তবে আমার হয়ে ওর পাছায় তিনটে লাথি কষবেন—তিনটে—ভুলবেন না—

অমিয় অনেকক্ষণ বসে থাকে। অফিসঘরটা অন্ধকার হয়ে আসে। অমিয় আলো জ্বালে না। রাস্তার নানা আলোর ছায়াছবি এসে সিলিংয়ে কাঁপতে থাকে, দেয়ালে চমকায়। কাকের পাখার মত অবসাদ নেমে আসে অমিয়র শরীর জুড়ে।

বাড়ির দেয়ালের কোন গোপন কোণে হঠাৎ উঁকি দেয় এক অশ্বত্থ চারা। কেউ লক্ষ্য করে না। কলতলায় শ্যাওলা জমে, দেয়ালের চাপড়া খসে পড়ে। কেউ লক্ষ্য করে না। কিন্তু ঐ ভাবেই অলক্ষিতে শুরু হয় একটা বাড়ির ক্ষয়। অমিয় নিজের ভিতরে সেই অশ্বত্থের গোপন চারাটিকে খুঁজছে। অনুসন্ধান করছে। শ্যাওলা জমল কোথায়, কোথায়ই বা খসে পড়ছে চাপড়া। খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু এ তো ঠিকই যে সে সেনগুপ্তকে ভয় পেতে শুরু করেছিল একদিন। অথচ ভয়ের তেমন কারণ ছিল না। গোলকীপারের পোশাক বহুকাল আগেই ছেড়ে ফেলেছিল সেনগুপ্ত, খুলে রেখেছিল দস্তানা, ক্রমে হয়ে আসছিল অমিয়র বশংবদ। সাপুড়ে কবে আবার তার ঝাঁপির সাপকে ভয় পেয়েছে ?

কিন্তু এর জন্য তো সেনগুপ্ত দায়ী নয়।

সারা কলকাতা দৌড়-ঝাঁপ করত অমিয়, আর তার স্কুটার। সন্ধ্যেবেলা বাড়ির সামনে থেমে ভারী স্কুটারটা অবলীলায় টেনে তুলত সিঁড়ির তলায়, শিস দিয়ে সিঁড়ি ভাঙত অমিয়। ভাবত দরজা বন্ধ করেই সে এক সুন্দর জগতে চলে যাবে। কিন্তু প্রায়দিনই সে অর্গলহীন দরজা ঠেলে এক আবছা অন্ধকার ঘরে ঢুকত। পরিত্যক্ত বাড়ির মত ঘর। দেখত, হাসি তার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেই। হয়তো শুয়ে আছে, কিংবা দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। মুখোমুখি হতে হাসির চোখে সে বিস্ময় দেখতে পেত। কোনদিন বা দেখত, হাসি ঘরে নেই।

পরস্পর আশ্লিষ্ট রতিক্রিয়ার সময়ে সে কি দেহসংলগ্ন হাসির শীৎকার শোনেনি ? অনুভব করেনি তার শিহরণ, বুকের ভিতরে

হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা ? লক্ষ্য করেনি মুখমণ্ডলে মুক্তোর মত স্বেদবিন্দু ? করেছিল। হাসির শরীরে অর্গলহীন দরজা খুলে ফেলে অমিয় দেখেছে, সেখানেও এক আবছা অন্ধকার ঘর—পরিত্যক্ত ঘরের মত নিরিবিলি—সেখানে হাসি সাজেগোজে, চুল বাঁধে, আয়নায় দেখে মুখ, প্রতীক্ষা করে—অমিয় সেই ঘরে ঢুকলে হাসি যেন অবাক মুখ তুলে নীরব প্রশ্ন করে—তুমি কে ?

মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল একদিন। গতবারে। জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে আন্নুর বিয়েতে যাবে তারা। সে আর হাসি। ধুতি-পাঞ্জাবি কোনদিনই পরে না অমিয়। ধুতি-পাঞ্জাবিতে কোনদিন অমিয়কে দেখেনি হাসি। বিয়েতে যাওয়ার সময়ে অমিয় সেদিন ওয়ার্ডরোব খুঁজে হাঁটকে বের করেছিল পাঞ্জাবি আর ধুতি। বহু যত্নে পরিশ্রমে ধুতির কোঁচা কুঁচিয়েছিল সে। অন্য ঘরে তখন হাসি সাজগোজ শেষ করে সবশেষে তার বেনারসী পরছে। হাসি বেরিয়ে এসে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অমিয়কে দেখে ভ্রূ ওপরে তুলে হেসে ফেলবে, বলবে—ওমা, তোমাকে যে চেনা যাচ্ছে না। এরকমই হবে বলে ভেবেছিল অমিয়। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ ঘরে, ও-ঘরের দরজার দিকে মুখ, মুখে অপ্রতিভ হাসি। হাসি বেরিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু একটুও অবাক হয়নি। ঘড়ি দেখে কেবল বলেছিল—বড় দেরী হয়ে গেল, বর এসে গেছে বোধহয়—তোমার হল ? একসঙ্গে তারা বেরলো, ট্যাক্সিতে উঠল, গেল বিয়ে-বাড়ি। সেখানে অমিয়কে পরিবেশন্ করতে হয়েছিল, বরযাত্রীদের তদারকও। দৌড়-ঝাঁপে পাঞ্জাবীর ভাঁজ গেল নষ্ট হয়ে, ধুতি গেল দুমড়ে-মুচড়ে, ঝোল-তেলের দাগ ধরল তাতে। ফেরার সময়ে আবার ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে আসছিল তারা। অমিয়র মুখে বিকেলের প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাসির সামনে দাঁড়ানোর সেই অপ্রতিভ হাসিটি কখন বিষণ্ণ ক্লান্তিতে ডুবে গেছে। শরীরের ঘামে, ঝোলে, তেলে ন্যাকড়া হয়ে গেছে তার পোশাক। হাসি তবু লক্ষ্য করেনি। ট্যাক্সিতে

হাসির খোঁপা থেকে বেলফুলের মালার গন্ধ আসছিল, আর প্রসাধনের সুবাস, গয়নার টুং-টাং শব্দ। অভিজাত মহিলাকে ভিখিরি যেমন দেখে, তেমনই হাসির দিকে ভয়ে ভয়ে একবার চেয়েছিল অমিয়। বলেছিল—হাসি, আমি আজ অন্য পোশাক পরেছিলাম। তুমি দেখনি।

হাসি চমকে বলল—কৈ ?

অমিয় হাসল—দেখছ না ?

হাসি ভ্রূ কুঁচকে বলল—নতুন পোশাক কোথায়, এ তো ধুতি আর পাঞ্জাবি, তুমি তো প্রায়ই পর।

—পরি! কবে পরেছি ?

—পরনি ? হাসি একটু ভেবে-টেবে বলে—গতবার মিঠুর কাকার শ্রাদ্ধের সময়ে পরেছিলে না ?

—না। অফিস থেকে এসেই তো তোমাকে নিয়ে বেরোলাম, পোশাক পাল্টানোর সময় ছিল না।

—তাহলে বোধহয় জামাইবাবুদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে।

—না।

—তবে নিশ্চয়ই দীপালীর বিয়ের সময়ে—

—তাও নয় হাসি।

—কী জানি! আমার তো মনে হচ্ছে তুমি পরেছ, আমি দেখেছি।

—না হাসি, তুমি দেখনি।

হাসি একটু হাসল, তারপর বলল—দেখি, কেমন দেখাচ্ছে! বাঃ বেশ তো, একদম নতুন মানুষ! তোমাকে চেনাই যাচ্ছে না!

শুনে কেমন একটু ভয় এসে ধরেছিল অমিয়কে।

এই সব তুচ্ছ ঘটনা থেকেই কি মানুষের ভয় জন্ম নেয়! মূল্যহীন হয়ে যাওয়ার ভয়! গুরুত্ব না পাওয়ার ভয়!

গির অরণ্যে একবার সিংহ দেখতে গিয়েছিল অমিয়। বহুকাল

আগে। দেখেছিল পিঙ্গল জটার মাঝখানে রাজকীয় গম্ভীর মুখ সিংহ বসে আছে, তার চারদিকে কয়েকটা সিংহী ঘুর-ঘুর করে কাছে আসছে, গা শুঁকছে, গড়-গড় শব্দ করে জানাচ্ছে তাদের প্রেম। পিঙ্গল জটার সিংহ গ্রাহ্যইকরছে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ, উদাসী, নির্মম সিংহকে দেখেছিল অমিয়, দেখেছিল তার ভয়ঙ্কর পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহটিতে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, নিষ্ঠুরতা। বারে বারে তার পায়ের কাছে, পিপাসার কাছে মাথা নত করে দিচ্ছে প্রেমিকারা, সে ফিরেও দেখছে না।

সেই সিংহটির কথা ভাবলে নিজের তুচ্ছতাকে বুঝতে পারে অমিয়, আজ। সে স্কুটারের পিছনে হাসিকে বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ক্যাথিড্রাল রোডে, উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে বের করেছিল, মিষ্টি মোলায়েম কয়েকটা কথা মনে মনে তৈরী করেছিল আগে থেকে। বিয়ের পর সে কত খুশী করতে চেয়েছে হাসিকে, নিজেকে বার বার নানা পোশাকে সাজিয়ে ডামির মত দাঁড়িয়েছে হাসির সামনে। হাসি তাকে ভালবাসেনি।

গির-এর প্রায়ান্ধকার অরণ্যে একটা সিংহকে প্রায়ই ভাবে অমিয়। সেই সিংহকে কেউ নারীপ্রেম শেখায়নি। প্রকৃতিদত্ত পুরুষকার বলে সে উদাসী, নির্মম। মানুষেরাও কি নয় সেই সিংহের মত! পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, পিঙ্গল কেশর ঘেরা মুখে বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার—পুরুষ এরকমই ছিল বহুকাল থেকে। কে তাকে শেখাল নারীপ্রেম, হাঁটু গেড়ে প্রেমভিক্ষা, মোলায়েম ভালবাসার কথা!

বলতে গেলে তখন থেকেই অমিয়র পতনের শুরু, যখন সে হাসির কাছে কাথিড্রাল রোডে, ময়দানের সুন্দর বাতাসে স্কুটারে ভেসে যেতে যেতে ভিক্ষা চেয়েছিল হাসিকে। তখনই তার পতনের, ক্ষয়ের প্রথম অশ্বখচারাটি উঁকি দিয়েছিল অলক্ষ্যে।

সেই পতনের প্রথম চিহ্ন ছিল এই, সে সারাদিন হাসির কথা

ভাবত। নির্বিকার হাসির কথা' তার নিষ্ঠুরতা, উপেক্ষা—ভাবতে ভাবতে তার ঘুম হত না। ডিগবয়ের তেল কোম্পানির বিলেত-ফেরত এঞ্জিনীয়ারটির কথা বলত হাসি, বলত তার শিলচরের প্রেমিক-দের কথা, তার মনিপুরী নাচের কথা। শুনতে শুনতে ভিতরে ভিতরে উন্মাদ হয়ে যেত অমিয়। কিনে আনত পোশাক প্রসাধন—হাসি মনের মত সাজত, হাসিকে খুশী করার জন্য সুন্দর সুন্দর কথা ভেবে রাখত সারাদিন, অন্যমনস্ক হাসির কাছে অনর্গল বলত—সে একদিন বড় হবে, খুব বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট্, বিজনেস্ ম্যাগনেট। সে হাসির জন্য শাড়ী কিনেছিল, গয়না, চমৎকার সব আসবাব, একটা ফ্রিজও। হাসি কিছুই তেমন আদর করে নেয়নি। অমিয়কেও না। রাতে শরীরে শরীর মিশিয়ে দিত অমিয়, মিশিয়ে ভাবত—পেয়েছি, পেয়েছি তোমাকে! তারপর মুখের স্বেদবিন্দু মুছে তৃপ্ত হাসি যখন পাশ ফিরে ঘুমোত, তখন উত্তপ্ত মাথায় সারা রাত ছিল অমিয়র জেগে থাকা। নিজের সেই পতন তখনও টের পায়নি অমিয়, তখনো গির অরণ্যে দেখা পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত-বিদ্যুৎ সেই সিংহের ছায়া তার চোখে পড়ত না। সে আধোঘুম থেকে চমকে জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে তখন, খুব জোরে স্কুটার চালাতে ভয় পেত, তখন থেকেই তার নিজের ভবিষ্যৎ এবং কর্মক্ষমতার ওপর সন্দেহ জন্মাতে থাকে। আর জন্ম নেয় ভয়।

ব্যবসা হচ্ছে তারের ওপর হাঁটা। সবাই লক্ষ্য রাখে, মানুষ কখন টলছে, পড়ো-পড়ো হচ্ছে, কখন পা ফেলছে না ঠিক জায়গায়। লক্ষ্য রেখেছিল তার সাপ্লায়াররা, পারচেজাররা, প্রতিদ্বন্দ্বীরা আর সেনগুপ্ত। সি-এম-ডি-এর একটা বিল পেমেন্ট গোপনে আদায় করেছিল সেনগুপ্ত চেক ক্যাশ করেছিল। অমিয় টের পেয়েছিল দেরীতে। দুর্দান্ত সেনগুপ্তর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল খুব। সেনগুপ্ত তার ক্যাপিট্যাল তুলে নিয়ে গেল। আর অন্যমনস্ক, দুঃখিত অমিয়র চোখের আড়ালে আদায় করে নিয়ে গেল আরো তিনটে বিল-পেমেণ্ট। সেগুলো

টের পেতে আরো অনেক দেরী হয়েছিল তার। কলকাতার রাস্তায় ভীড়ে আজও সেনগুপ্তকে খুঁজে বেড়ায় অমিয়। কিন্তু দেখা হলে কী করবে তা বুঝতে পারে না। চোখ বুজলেই সে দেখতে পায়' কালো শার্ট, লাল টুকটুকে গেঞ্জী, দস্তানা পরা দুটি উদ্যত হাত, টুপির ছায়ায় আলপিনের মত দুটি হিংস্র চোখ—সেনগুপ্ত ফনা তুলে দুলছে। পোস্টে পোস্টে উড়ে যাচ্ছে সেনগুপ্ত, পেনালটি আটকাচ্ছে বেতের মত শরীর বেঁকিয়ে। আশ্চর্য! সেনগুপ্তর খেলা কোনদিনই দেখেনি অমিয়, তবু চোখ বুজলেই ঐ কাল্পনিক ভয়ঙ্কর দৃশ্যটিই সে দেখতে পায়।

বাইরের লড়াই যে হারতে থাকে, সে তত ভিতরে ঢুকে কল্পনার দৃশ্য দেখে। কল্পনায় প্রতিশোধ নেয়, কল্পনায় ভয় পায়। হাসির জন্যই কি? কে জানে!

অমিয় আলো জ্বালল না। অন্ধকারেই উঠল। দু-একটা কাগজ গুছিয়ে রাখল, বন্ধ করল ডেস্ক, চাবি কুড়িয়ে নিল। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওপর থেকেই বৃষ্টির গন্ধ পায় অমিয়। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগে।

গাড়ি-বারান্দার তলায় এক ভীড় লোক বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুটারটা ফুটপাথে তুলে রেখেছে আহমদ। স্কুটারটা ছুঁয়ে বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টি একটুক্ষণ দেখে অমিয়। তারপর স্কুটারটা টেনে বৃষ্টিতে রাস্তায় নেমে পড়ে। বৃষ্টির ঝরোখার ভিতর দিয়ে তার প্রিয় স্কুটার চলে লঞ্চের মত জল ভেঙ্গে। অমিয় ভিজতে থাকে। কপালের ঘামের নোনা স্বাদ জলে ভিজে গড়িয়ে এসে স্পর্শ করে তার জিভ। একটা সুন্দর কাচের বাসন ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে যেমন দেখায়, বৃষ্টির ভিতর তেমনি শতধা বিদীর্ণ কলকাতার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। চারদিকের কাচের ঠুকরোর মত ধারালো, রঙীন, ভঙ্গুর কলকাতা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

গড়িয়াহাটা পর্যন্ত একটানা চলে এল সে। তারপর খাড়াই

ভেঙে স্কুটার উঠতে থাকে গড়িয়াহাটা ব্রীজের ওপর, ধনুকের পিঠের মত সম্মুখ অড়াল করে উঠে গেছে রাস্তা। স্কুটারের মেশিন গোঙাতে থাকে ভয়ঙ্কর। বরাবর এইটুকু উঠতে ভাল লাগে তার। ঝড় তুলে স্কুটার উঠতে থাকে। ব্রীজের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুতে উঠে এলে হঠাৎ দিগ্‌দিগন্তের বাতাস ঝাপটা মারে এসে, চারদিকে বহু দূরের বিস্তার ডানা মেলে দেয়। সামনে স্বচ্ছন্দ উৎরাইয়ের শেষে তার বাসা। বাসায় হাসি।

প্রবল বৃষ্টির ফোঁটা বর্শাফলকের মত ঝকঝকে হয়ে ছুটে আসে। মুখের চামড়া ফেটে যায়। ব্রীজের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুটিতে বাতাস পাগল, বৃষ্টির ফোঁটা খরশান। স্কুটার টাল খায় এখানে। ডানদিকে একটা অন্ধকার মাঠে বিস্ফোরকের মত বিদ্যুৎ ফেটে পড়ে। এমন বাদলার দিন—এই দিনে হাসির কাছে ফিরে গিয়ে কী হবে অমিয়র ?

অমিয় উৎরাই ভেঙে নেমে আসে। বড়রাস্তার ওপর ঐ দেখা যায় অমিয়র বাসা। দোতলায় আলো জ্বলছে, উড়ছে সবুজ পর্দা। বাইরের দিকে একটা ঝুল-বারান্দা। অমিয় একপলক তাকায়। তারপর অচেনা বাড়ির দিকে চেয়ে যেমন চলে যায় রাস্তার লোক, তেমনিই না থেমে চলতে থাকে অমিয়। স্কুটার ভেসে যায়।

বহুদূর পর্যন্ত সোজা চলে তার স্কুটার। তারপর বাঁক নেয়। রাস্তার আলো এখানে ক্ষীণ, বহু দূরে দূরে। দু-ধারে গাছ-গাছালি, ব্যাঙের ডাক শোনা যায়, রাস্তায় লোকজন বিরল। এক-আধটা দোকান খদ্দেরহীন, আলোজ্বেলে বসে আছে দোকানী। এই সব রাস্তা পার হয়ে অমিয়র স্কুটারের আলো পড়ে একটা লেভেল ক্রসিংয়ের সাদা লোহার গেটে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় লাফায় হাল্কা স্কুটার, ভেঙ্গে পড়তে চায়। অমিয় দাঁতে দাঁত চেপে হাতল সোজা রাখে। লেভেল ক্রসিংয়ে লাইনের মাঝখানে গভীর খন্দ, তাতে জল জমে আছে। ঝাঁকুনীতে ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে পড়তে চায়। গর্তে পড়ে জলে ঢেউ তোলে স্কুটার। অমিয়র জুতো-মোজা ভিজে

যায়। লেভেল ক্রসিং পার হয়ে অন্ধকার কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দুধারে ফাঁকা জমিতে দু একটা ঘুমন্ত বাড়ী চোখে পড়ে। স্কুটার গোঙায়, তবু এগোয় ঠিক। বহুকাল আসা হয় না এদিকে। রাস্তাটা একটু গোলমেলে লাগে, স্কুটার থামিয়ে হেডলাইটটা বার কয়েক চারধারে ফেলে অমিয় স্কুটার ছাড়ে। এগোয়। অনেকটা গিয়ে ডানধারে ইটখোলাটা দেখতে পায় অমিয়। নাবাল মাঠে জল জমে গেছে। কী গম্ভীর ব্যাঙের ডাক। মনে হয় রাত নিশুতি হয়ে গেছে। ইটখোলার গা বেয়ে একটা শুঁড়ি পথ। দুধারে এই বর্ষায় আগাছা জন্মেছে খুব। পিছল হয়েছে রাস্তা, ক্ষয়ে গেছে। সেই রাস্তায় স্কুটার এগোয় না। এঁটেল মাটিতে চাকা পড়ে একই জায়গায় ঘুরতে থাকে। অমিয় টেনে তোলে। আবার এগোয়।

একটা নিমগাছ ছিল এখানে, আর কলার ঝাড়। সামনে উঠোন। মনে করতে চেষ্টা করে অমিয়। স্কুটার অনিচ্ছায় বহন করে তাকে। অনেকটা ভিতরে ঢুকে যায় সে। চারিদিকে বাড়ি-ঘর নেই। আলো নেই। কোন মানুষ চোখে পড়ে না। অমিয় এগুতে থাকে। আঁকা-বাঁকা পথে স্কুটার ঘোরে। কাদা ছিটকে আসে, ব্যাঙ লাফায়, জলের কল কল শব্দ হতে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায় জলে-স্থলে। অমিয় প্রাণপণে চেয়ে দেখে, চিনতে চেষ্টা করে জায়গাটা। বহুকাল আশা হয়নি। বহুকাল।

স্কুটার লাফিয়ে উঠে একটা কলার ঝাড়ে আলো ফেলে এক মুহূর্তের জন্য। আভাসে একটা নিমগাছ দেখা যায় অবশেষে। উঠোন জলে ভাসছে। একটা অন্ধকার বেড়ার ঘর, টিনের চালে অবিরল বৃষ্টির শব্দ উঠছে। অমিয় স্কুটার থেকে নেমে উঠোনের আগল ঠেলে গোড়ালি-ডুব জলে পা দেয়। ডাক দেয়—খুড়ীমা! ও খুড়িমা!

দরজা খুলতেই একটা হ্যারিকেনের ম্লান, হলুদ আলো দেখা যায়।

—কে?

অমিয় বাবান্দায় উঠে আসে। একটা ন্যাতো গেঞ্জী গায়ে বোকা

চেহারার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। শোভনাদির ছেলে ভাসান। অমিয় চিনতে পারে।

—ভাসান, আমি অমিয় মামা। খুড়ীমা কেমন আছে?

ছেলেটা ঠিক চিনতে পারে না প্রথমে, বিশ্বাস করতে পারে না। বোকা চোখে চেয়ে থেকে একটু সময় নেয় বুঝতে। তারপর বলে—অমিয়মামা? তুমি এই রাতে? কী হয়েছে?

অমিয়র হঠাৎ লজ্জা করতে থাকে। কী বলবে সে! এত রাত্রে মানুষ বড় জোর বাড়ী ফেরে। কোথাও যায় না।

ভিতর থেকে ঘুম-ভাঙা বুড়ি গলায় কে জিজ্ঞেস করে—কে রে? কে এল রে ভাসান?

—অমিয়মামা।

—কে অমিয়?

ভাসান আলোটা সরিয়ে দরজা ছেড়ে বলে—ভিতরে এসো অমিয়মামা। দিদিমা ভাল নেই। হার্ট খুব খারাপ।

অমিয় তার ভেজা জুতো ছাড়ে। জামা-প্যাণ্ট থেকে যতদূর সম্ভব জল ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। ঘরে ঢুকতেই ম্লান আলোয় বহুদিন আগেকার সেই ঘর খানা দেখে। হ্যারিকেনের গন্ধে ঘর ভরা, বিছানায় মশারি ফেলা! মশারির ভিতর হাতপাখা নড়ার শব্দ। খুড়ীমার কাছে মা মরার পর বহুদিন শুয়েছিল অমিয়। ঘুমের মধ্যেও খুড়ীমার পাখা নড়ত নির্ভুলভাবে।

—কে এলি রে? মশারির ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে।

—আমি খুড়ীমা, আমি অমিয়।

একটা অস্ফুট শব্দ করে খুড়ীমা, গোঁজা মশারীর এক দিক তুলে বুড়ো মুখখানা বের করে। চোখে আলো লাগতে মিট মিট করে তাকিয়ে বলে—অমিয় মানে মেজঠাকুরের ছেলে?

ভাসান ধমক দেয়—তো আর কে অমিয় আছে?

—হ্যারিকেনটা তোল তো ভাসান, দেখি। অমিয়, কাছে

আয়। দেখি তোর গা। ঠিক তুই তো?

ভাসান বলে—শার্টটা ছেড়ে ফেল অমিয়মামা। ইস্! তুমি খুব ভিজে গেছ।

অমিয় বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে—খুড়ীমা, তুমি এত বুড়ো হলে কবে? এত বুড়িয়ে যাওয়ার কথা তো ছিল না তোমার।

—তুই কি এই বৃষ্টিতে এলি? কী হয়েছে তোর? খারাপ খবর আছে কিছু? কাছে আয় না, দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

—তুমি কাকার থেকে চৌদ্দ বছরের ছোট ছিলে, তবে বুড়ো হলে কী করে?

মশারি তুলে খুড়ীমা উঠে বসে। গা উদোম। কাপড় খসে গেছে। কোমরের কাপড় ঠিক করতে করতে বলে—তোর কাকা গেছে বিশ বছর আগে, তখনই আমার পঞ্চাশ পুরে গেছে। বয়েসের হিসেব তুই কি জানবি? মেজোঠাকুরের বুড়োবয়সের সন্তান তুই। তোর জন্মের সময়ে মেজোঠাকুরের বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, তোর মা-র চল্লিশ। তোর এখন বয়স কত?

—পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

—তবে? বয়সের হিসেব ঠিক রাখতে পারিস না তোরা। কাছে আয় তো দেখি, কীরকম ভিজেছিস!

খুড়ীমা হাত বাড়িয়ে অমিয়কে ধরে কাছে টেনে নেয়। সমস্ত শরীরে মরা হাতখানা দিয়ে সেঁক দেওয়ার মত চেপে চেপে ধরে তার শরীর দেখে।

—তুই কি পাগল? এমন কাক-ভেজা কেউ ভেজে? ভাসান, জামাকাপড় দে এক্ষুনি, তার আগে গামছা দে। রাখুকে বল এক পাতিল আগুন করতে, সেঁক না দিলে ও মরে যাবে।

—খুড়ীমা, তুমি কেমন আছ?

—কী জানি। ডাক্তার বলেছে, ভাল না। কাপড়ে-চোপড়ে হেগে মুতে ফেলি, আর বুকে একটা চাপ ব্যথা হয়। কতকাল আসিস না।

—আজ তো এলাম।

—এটা কীরকম আসা। তোর মাকে আমি রোজ স্বপ্নে দেখি। আমার ভরসায় তোকে ছেড়ে গিয়েছিল, তাই রোজ এসে খবর নিয়ে যায়। বাইরের নিমগাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে, ডাকে। বহু-কালের পুরনো ঝগড়া শক্রতা তার সঙ্গে। ক'দিন পর আমিও তো তার কাছে যাব, এখন যদি তোর কিছু হয় তো সে আমাকে আস্ত রাখবে? এই বৃষ্টিতে ভিজে এলি, তুই কেমন পাগল? ও ভাসান—

—দিই।

—তাড়াতাড়ি দে।

—খুড়ীমা, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি, চলে যাব। এখন আর জামা-কাপড় ছেড়ে কী হবে?

—তোর বর্ষাতি নেই? ছাতা কিনিসনি? ওরে তোরা ওঠ, ও ভাসান, পাখীকে বল চা করবে, রাখুকে ঠেলে তুলে দে, পাতিলের আগুনটা করে দিক, আমি ওকে সেঁক দেব। অমিয়, কেন এসেছিস? অমিয়র বলতে ইচ্ছা করে, এইজন্যই। কিন্তু তা বলে না অমিয়, বলতে নেই। চুপ করে থেকে তার বুকে পিঠে মাথায় কঙ্কালসার হাতখানা অনুভব করে সে। এইটুকুর জন্য এত রাতে, দীর্ঘ পথ জল কাদা ঝোড়ো বাতাস ভেদ করে এসেছে সে।

—কেন এসেছিস? আমাকে দেখতে? আমি মরে গেলাম কিনা দেখতে এসেছিস? বলতে বলতে খুড়ীমা একটু কাঁদে। বলে—সত্যিই খুড়ীমাকে ভালবাসিস অমিয়? তোর বৌ বাপের বাড়ীতে গেছে নাকি? বাচ্চা-কাচ্চা হবে না তো?

—না।

—তোর বাচ্চা হয় না কেন রে? অ্যাঁ। কী করিস তোরা? আঁট-বাঁধ দিয়ে রেখেছিস নাকি? বুড়োবয়সে হলে মানুষ করার সময় পাবি না। এখন হইয়ে ফেল।

—চুপ কর খুড়ীমা।

—আমার তো ছেলে নেই। ভাসানকে বলি তোর খবর আনতে। তা সে তোর দোরগড়ায় গিয়ে গিয়ে ফিরে আসে, ভিতরে ঢোকে না, এসে বলে—মামা বাড়ীতে থাকে না, মামীকে চিনি না, লজ্জা করে। আমি অবাক হই। মামীকে আবার চেনার কি আছে। গিয়ে কোলে বসে পড়বি, আবদার করবি, জ্বালাবি—তাতেই চিনবে।

—চুপ কর, তুমি চুপ কর।

—চুপ করব কেন? অমিয়, কেন এসেছিস?

—তোমাকে দেখতে।

ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে রাখী তার পাখী। কেটলীতে জল ফোটে। পাতিলে কাঠকয়লার আগুন জ্বালে রাখী। অমিয় খালি গায়ে, ধুতি পেঁচিয়ে বসে। তাকে ঘিরে হ্যারিকেনের আলোয় একটা ছোট উৎসব শুরু হয়।

—আমার কেউ নেই অমিয়। শোভনা তার তিন ছেলেমেয়ে রেখেছে আমার কাছে, রক্ষা। ভেবেছিলাম, শোভনা আমার মেয়ে আর তুই ছেলে। তুই কেমন ছেলে?

পাতিলের আগুনের ওপর তুই হাত মেলে ধরে খুড়ীমা। গরম হাত দুখানা এনে তার গায়ে চেপে চেপে ধরে। কতকালের পুরনো এক রক্তস্রোত আর এক রক্তস্রোতের খবর নিতে থাকে।

—রাখু, ভাত চড়াসনি?

—না তো! মামা কি খেয়ে যাবে?

—খেয়ে যাবে না তো কী? কোথায় খাবে?

—আমি খাব না খুড়ীমা।

—কেন খাবি না? বৌ রেঁধে রেখেছে বলে? গেরস্তর ঘরে কখনও ভাত নষ্ট হয় না। খেয়ে যা। আপিস থেকে এলি তো?

—হ্যাঁ।

—পাখী, তুই একটু হাত গরম করে শেঁক দে। আমি একটু শুই, বুকটা কেমন করে।

—কথা বোলো না।

—বলব না। কেন? কাছে এসে বোস আরো। তোর বৌকে বিয়েতে আমি গয়না দিইনি, না? কী দিয়েছিলাম যেন?

পাখী মুখ তুলে বলে—দিয়েছিলে। নাকছাবি।

—ওঃ। নাকছাবি আবার গয়না! অমিয়, তোর ছেলেমেয়ে হলে একছড়া গোঠ দেবো। তিন ভরি সোনা। তুই কোথায় থাকিস যেন?

—ঢাকুরিয়া।

—সে কী অনেক দূর? যদি দূর না হয় তো তোর বৌ, কী-নাম যেন, তাকে নিয়ে আসিস। ভাসান, পাখী, তোরা ওর সঙ্গে কথা বলছিস না কেন? কথা বল।

—তুমি অত তাড়া দিলে কথা বলবে কখন? চা করছে, গা সেঁকছে, ভাত রাঁধছে, ওদের তো বসতেই দিচ্ছ না।

—তাড়া কি সাধে দিই! তোর মাকেই আমার ভয়। তার মুখের বড় ধার ছিল। এখনো এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে জিভ শানাচ্ছে, আমি গেলেই ধরবে আমাকে। হ্যাঁ রে, পরের মেয়ে বৌ হয়ে এসে আপনজন হয়ে যায়, আর পরের মা কিছুতেই কি মা হতে পারে না? কেন এসেছিস অমিয়?

—খুড়ীমা, তুমি আমাকে গল্প বল।

—কিসের গল্প শুনবি?

—আমার গল্প বল। আমি কেমন ছিলাম?

—তুই? তুই আবার আলাদা কি ছিলি! আর পাঁচজনের মতই ছিলি তুই। শিশুকালে সবাই এক থাকে, বড় হয়ে আলাদা রকমের হয়।

—তবু বল।

—খুব দুষ্টু ছিলি। ভীষণ। মা ছিল না বলে তোর আদর ছিল সবচেয়ে বেশী। আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠেছিলি। তোর দিদি নানি সেই তুলনায় ঠাণ্ডা ছিল। পারুলিয়ার বাড়িতে একটা মস্ত দিঘি ছিল—তার এপার ওপার দেখা যায় না, তার কালো জল খুব গভীর, বড় বড় মাছ ছিল। দিঘির পারে একটা ডিঙ্গিনৌকো বাঁধা থাকত—তাতে চড়ে মাঝ-দিঘিতে শ্বশুরমশাই মাছ ধরতে যেতেন। সেই ডিঙ্গিনৌকোয় চড়ে এক দুপুরে তুই আর নানি চুপি চুপি দিঘির মাঝখানে চলে গিয়েছিলি। চীৎকার শুনে আমরা দিঘির পারে গিয়ে দেখি, নানি উঠে দাঁড়িয়ে বৈঠা তুলে চেচাঁচ্ছে, তুই নৌকোর এক ধারে ঝুঁকে আছিস। কেৎরে নৌকোটা ভেসে আছে। সে যে কতদূর চলে গিয়েছিলি তোরা—এই টুকু টুকু দেখাচ্ছিল তোদের। চারদিক থেকে লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, কিন্তু তোরা এতদূরে যে পৌঁছতে পারছিল না। নৌকোটা কেবলই কাৎ হচ্ছিল তখন, তুই ঝুলে ছিলি, পড়ে যাচ্ছিলি। কী ভয় আমাদের!

—তুমি কী করেছিলে?

—আমি! আমি কী করব? বোধহয় খুব চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তোরা মা-মরা দুটো ভাইবোন কেন যে ঐ বিদঘুটে খেলা করতে গিয়েছিলি! লোকে বলাবলি করেছিল যে তোদের ভূতে পেয়েছে। কেন গিয়েছিলি অমিয়?

—আমরা কী করে ফিরে এলাম আবার?

—কেউ ধরার আগেই তুই ঝাঁপ দিয়েছিলি জলে। তোকে কেউ ধরতে পারেনি। একা সাঁতরে এলি পারে। খুব রোখ ছিল তোর।

—খুড়ীমা, আমি একটা জলের স্বপ্ন খুব দেখি।

—কী রকম জল?

—অনেক জল, অথৈ জল। একটা খুব বড় নদী, তার ওপার দেখা যায় না। তার একধারে একটা বিরাট বালিয়াড়ি, আর একটা স্টীমার বাঁধার জেটি। সেখানে কেউ নেই। বালির ওপর একটা

কেবল সাপের খোলস পড়ে আছে।

খুড়ীমা হঠাৎ রোগা, মরা হাত বাড়িয়ে অমিয়র হাত ধরে। বলে—অমিয়, কী বলছিস?

—একটা স্টীমারঘাটের কথা। একটা বালিয়াড়ির কথা।

খুড়ীমা একটু চুপ করে থাকে।

—খুড়ীমা তুমি এই স্টীমারঘাটের কথা কিছু জান?

খুড়ীমা, আস্তে আস্তে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বলে—না তো! স্টীমারঘাটের কথা কী জানব! তুই কবে থেকে এটা দেখিস?

অমিয় একটু ভাবে। তারপর বলে—অনেকদিন থেকে। এক দিন ঘুমের মধ্যে ঐ স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। তারপর আবার ঘুমোই, আবার সেই স্বপ্ন। তিনবার করে স্বপ্নটা দেখে আর ঘুম হল না। একা একা শুয়ে খুব ভয় করতে লাগল। মনে হল, কেউ পাশে থাকলে খুব ভাল হত।

—বৌয়ের সঙ্গে কি তোর ঝগড়া অমিয়?

—কেন, ওকথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

—এই যে বললি—তুই একা শুস। একা শুবি কেন অমিয়? বৌ বিছানায় নেয় না? আলাদা শোয়? তা তার এত গুমোর কিসের? ঐ জন্যই তোদের বাচ্চা হয় না—

—খুড়ীমা স্টীমারঘাটের কথাটা আগে শোন।

—কী শুনব! স্টীমারঘাটের কথা আমি কিছু জানি না। রাখু, ভাতটা টিপে দ্যাখ, হাঁ করে গল্প শুনছিস, ভাত গলে যাবে। একটু ডাঁটো থাকতে নামাস, অমিয় ঝরঝরে ভাত ভালবাসে। ভাসান, কত রাত হল রে?

—ন'টা।

—অমিয় যাওয়ার সময়ে টর্চ জ্বেলে বড়রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিস। আমি একটু চোখ বুজে থাকি। আমার মনটা ভাল লাগছে না।

—কেন খুড়ীমা?

—তুই কেন স্টীমারঘাটের কথা বললি? ওসব অলক্ষুণে কথা, মন বড় খারাপ হয়ে যায়।

খুড়ীমা মশারির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে নেয়, হাতপাখার মৃদু শব্দ হতে থাকে। রাখু এসে বলে—মামা, রান্না হয়ে গেছে। বসবেন না?

অন্যমনস্ক অমিয় ওঠে।

খেয়ে উঠে পোশাক পরছিল অমিয়। খুড়ীমা ঘুমচোখে বলে—ভেজা পোশাক আবার পরছিস অমিয় ঠাণ্ডা লাগবে না? ওগুলো ছেড়ে রেখে যা—

রাখু বলে—উনুনে ধরে শুকিয়ে দিয়েছি দিদিমা।

—ওতে কি শুকোয়? সেলাইয়ে জল থেকে যায়। স্টীমারঘাটের কথা যেন কী বলছিলি অমিয়?

—তুমি তো শুনতেই চাইলে না।

খুড়ীমা একটু অস্ফুট শব্দ করে। তারপর বলে—ছেলেবেলা থেকে তুই বড় একা। সেই জন্যে তোর দুঃখ নেই তো অমিয়? তোর মা-বাপ নেই—সে বড় দুঃখ। আমি তোর মা হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চাইলেই কি হওয়া যায়! নিজের মেয়েটা, এই যে সব নাতি-নাতনী—এ সব থেকেও তো কেমন একা লাগে। রাত্-বিরেতে ঘুম ভাঙলে কারো নাম মনে পড়ে না। ডাকতে গিয়ে দেখি, মাথা অন্ধকার লাগে। মনে হয় কেউ নেই আমার। সে বড় কষ্ট। ভাবি, মানুষের আপনজন কে-ই বা আছে! তুই কেন এসেছিলি যেন অমিয়?

—তোমাকে দেখতে।

একটা শ্বাসের শব্দ হয়। খুড়ীমা বিছানায় পাশ ফিরে শোয়। তারপর বলে—স্টীমারঘাটের কথা কেন বললি? কী জানি কেন, আমিও ঠিক একটা ধূ ধূ বালির চর দেখতে পাই এখন, অনেক দূরে

একটা ঘাট, তারপর অথৈ জল…সাবধানে যাস অমিয়, উঠোনটা পিছল, রাস্তা ভাল না, অনেক রাত হয়েছে।

—খুড়ীমা, তুমি ঘুমোও।

—ঘুম কি আসে! ভাসান, টর্চটা ধর। অমিয়, তোর বৌয়ের নাম যেন কি?

—হাসি।

—হাসি! হাসির কেন বাচ্চা হয় না রে? আঁট-বাঁধ দিয়ে রেখেছিস নাকি?

—অমিয় চুপ করে থাকে।

—বাচ্চা না হলে বৌ আপন হয় না। আঁটকুড়ি নয় তো? ডাক্তার দেখাস। তোর কেউ নেই অমিয়, বাচ্চা-কাচ্চা হলে একটু বাঁধা পড়বি। কিন্তু বয়স হলে আবার সেই—

—কী?

—সেই যে কী যেন বললি! সেই স্টীমারঘাট—অথৈ জল… অমিয়, সাবধানে যাস—

মেঘ কেটে ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্না পড়েছে। অমিয় নির্জন রাস্তায় তার স্কুটার চালায়। বাতাস লাগে, জল-মাটির গন্ধ পায় সে। চলতে থাকে। হাসি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। অমিয়র ঘুম হয় না আজকাল।

দূরে সিংহের ডাকের মত মেঘগর্জন শোনা যায়। গির-অরণ্যে দেখা এক সিংহের অবয়বের ছায়া পড়ে অমিয়র চোখে। সে চলতে থাকে!
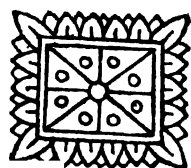
স্কুটারের শব্দ ঠিকই শুনতে পেল হাসি। আধো-ঘুমের মধ্যেও। যেন এতক্ষণ সে এই শব্দের অপেক্ষায় ছিল। উঠে ঘড়ি দেখল সে। রাত এগারোটা বেজে গেছে। অমিয়র জন্য তার কোন কৌতূহল নেই। সে শুধু আধো জেগে ছিল বলে মাঝে মাঝে রাস্তার চলমান স্কুটারগুলির শব্দ শুনে উঠে একবার ঘড়ি দেখেছে। কোন স্কুটারের শব্দই এতক্ষণ থামেনি।

হাসি শুনতে পেল, অমিয় স্কুটার টেনে সিঁড়ির নীচে উঠিয়ে রাখছে। আবার বিছানায় এসে শুয়ে থাকল হাসি। আগে আগে অমিয় এলে অন্ততঃ খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসত সে। মুখোমুখি দু'চারটে কথা হত। খাওয়ার পর ছিল তাদের বাঁধা রতিক্রিয়া। এখন আর হাসি খাওয়ার টেবিলে যায় না।

সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে অমিয়র পায়ের শব্দ, ভেজানো দরজা ঠেলে ও-ঘরে ঢোকে। জামাকাপড় ছাড়ে। বাথরুমে যায়।

ও-ঘর থেকে একটা চৌকো আলো এসে এ ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকে। অনেকক্ষণ। অমিয়র রাত্রে ভাল ঘুম হয় না—হাসি জানে। অনেক রাত জেগে ও বই পড়ে। সিগারেট ধরানোর শব্দ হয় রাতে, পায়চারীর শব্দ হয়, কাশির।

চৌকো আলোটাতে একটা মানুষের ছায়া পড়ে। বাঁকা ছায়াটা, একটা কাঁধ উঁচু দেখায়, মাথাটা বেঁকে পড়ে আছে।

হাসি চেয়ে থাকে।

দরজার কাছ থেকে অমিয় বলে—কেউ এসেছিল?

হাসি মৃদুগলায় বলে—টেলিফোনের লোক। কাল তোমার টেলিফোন দিয়ে যাবে।

—টেলিফোন। একটু অবাক হয় অমিয়।

—বলল, তুমি তিনবছর আগে অ্যাপ্লাই করেছিলে, এতদিনে মঞ্জুর হয়েছে।

—টেলিফোন দিয়ে আমি এখন কী করব!

হাসি একটু হাসে। বলে—লোকের সঙ্গে কথা বলবে। কত কথা আছে মানুষের, শোনার লোকেরও অভাব নেই।

—আমার কোনো কথা নেই।

—কে বলল নেই! শুনতে পাই, তুমি লোককে একটা স্টীমার-ঘাটের কথা বল।

—সে কথা থাক হাসি। আর কে এসেছিল?

—এক বুড়োমত ভদ্রলোক, তোমার পিসেমশাই। তাঁর মেয়ের বিয়ের চিঠি রেখে গেছেন।

—চিঠি দেখেছি। তিনি কিছু বলেন নি?

—বলেছেন। পরশু বিয়ে, আমি যেন অবশ্যই তোমাকে নিয়ে বিয়েতে যাই। অনেকবার বললেন। আমি বলেছি—যাব। চা করে খাইয়েছি। অনেকক্ষণ বসেছিলেন তোমার জন্য।

—আর কিছু বলেন নি?

—না। বোধহয় কিছু বলার ছিল, তোমাকে বলতেন। আমাকে কিছু বলেন নি।

—বলেছিলাম, রেখার বিয়েতে এক হাজার টাকা দেব। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে ভাবি নি।

—দেবে যখন বলেছিলে তখন তো দেওয়াই উচিত। ওঁর পোশাক দেখেই মনে হয় অবস্থা ভাল না।

—কোথা থেকে দেব?

—তুমি আমাকে যে সব গয়না দিয়েছিলে সব স্টীলের আলমারীতে আছে। দরকার হলে নিতে পার, আমি তো নিচ্ছি না।

—আমাদের বংশের কেউ কখনো ঘরের জিনিস বেচেনি।

—তা হলে কী করবে ?

—বুঝতে পারছি না।

হাসি লক্ষ্য করে একটা ধুতি জড়িয়ে অমিয় দাঁড়িয়ে আছে। কোমরের ওপর ওর খালি গা। পিছন থেকে আলো এসে পড়েছে ওর গায়ে। মাথাটা বোধহয় ভেজা, পাটকরা চুল থেকে আলো পিছলে আসছে। লম্বাটে হাড়সার দেহ অমিয়র। অমিয় রোগা হয়ে গেছে কিনা তা ঠিক বুঝতে পারে না হাসি। এসব বোঝা খুব মুশকিল। ঐ দেহটির স্বাদ সে বহুবার পেয়েছে। তার দুই হাতে, নগ্ন শরীরের আনাচে-কানাচে আজও ছড়িয়ে আছে সেই স্বাদ। কত-বার সে বেষ্টন করেছে ঐ শরীর, মথিত হয়েছে। তবু ঐ শরীরের সব খবর তার জানা নেই।

অমিয়র ঠোঁটে একটা সিগারেট একটু জ্বলে উঠল। সেই আগুন-টাই বোধহয় একটা আশ্লেষ তৈরি করে হাসির শরীরে। সে শরীরের ভঙ্গী বদলায়। হঠাৎ প্রশ্ন করে—তোমার ওজন কত ?

অমিয় একটু থমকে থাকে। প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে—কী বলছ ?

—তোমার ওজন কত ?

—কেন ?

—এমনই জিজ্ঞেস করছি। জামাইবাবু বলছিল, তুমি নাকি রোগা হয়ে গেছ। তোমার কি ওজন কমে গেছে ?

—কী জানি।

—তুমি ওজন নাও না ?

—না।

হাসি একটু শ্বাস ফেলে বলে—আমার রিজার্ভেশন পাওয়া যায় নি। কলকাতায় আমাকে আরো কয়েকদিন থাকতে হবে।

—থাকবে। তাতে কী ?

—আমি দিদি-জামাইবাবুর কাছে চলে যেতে পারতাম এ

ক'দিনের জন্য। কিন্তু সেখানে পাশের ফ্ল্যাটে তোমার দিদি-জামাই-বাবু থাকেন। গেলে ওঁরা নানা রকম সন্দেহ করতে পারেন বলে যাই নি।

—যেমন তোমার ইচ্ছে।

—খুশীর বিয়ের তারিখ এসে গেল! রিজার্ভেশন পাওয়া যাচ্ছে না। কী যে করব!

—প্লেনে চলে যাও।

—তুমি ভাড়া দেবে? অনেক ভাড়া কিন্তু।

—দেব।

—তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ।

—প্লেনের ভাড়া কত?

—দু-তিন শো হবে বোধহয়। আমি ঠিক জানি না। তোমার ব্যবসার অবস্থা কী?

—ভাল নয়।

—খুব খারাপ?

—হুঁ।

—কী রকম খারাপ?

—উঠে যাওয়ার মত।

—কেন?

—হাসি, আমি প্লেনের ভাড়া ঠিক দেব।

হাসির ঘুম পায়। সে হাই তুলে বলে—দরজার পর্দাটা টেনে দেবে? চোখে আলো লাগছে।

পরদিন দুপুরবেলা জামাইবাবুকে ফোন করে হাসি।

—জামাইবাবু, রিজার্ভেশন যদি না পাওয়া যায় তো আমি প্লেনে যাব।

—তার দরকার নেই, তেরো তারিখের একটা স্লিপার বার্থ পাওয়া গেছে।

—পাওয়া গেছে? সত্যি?

—সত্যি। সুখের পাখী এবার উড়ে যাও।

হাসি চুপ করে থাকে।

—ফোন কি ছেড়ে দিয়েছ হাসি?

—না।

—কাল ছেড়ে দিয়েছিলে। একটা প্রশ্নের জবাব দাও নি।

—জামাইবাবু, আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাঁটি হয় নি। কথাবার্তা বন্ধ হয় নি। কাল রাতেও অনেকক্ষণ আড্ডা মেরেছি। আমরা সম্পূর্ণ নরমাল। এমন কি কোর্ট-কাছারির কথাও ভাবছি না।

—তবে কি ফিরে আসার কথাও ভাবছ?

—না।

—তুমি কোথা থেকে ফোন করছ হাসি?

—কেন?

—ফ্রলী কথা বলতে পারবে?

—আমি বাসা থেকে ফোন করছি।

—বাসা থেকে! বাসায় কবে ফোন এল?

—আজ। বছর তিনেক আগে অ্যাপ্লাই করেছিল, আজ ক্যানেকশন দিয়ে গেছে।

—ফোন কেন নিতে গিয়েছিল অমিয়? দুপুরে অফিস থেকে তোমার সঙ্গে প্রেম করার জন্য?

—হবে হয়তো।

—ফোন কোম্পানীর মত বেরসিক দেখিনি। যখন পাখী উড়ে যাচ্ছে তখনই এল ফোন! এখন দুপুরে কার সঙ্গে কথা বলবে অমিয়? বেচারা!

—কি বলছিলেন বলুন ?

—ডিগবয়ের তেল কোম্পানীর সেই এঞ্জিনীয়ার, সে এখনো বিয়ে করে নি শুনেছি। সত্যি ?

—সত্যি।

—সে কখনো তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল হাসি।

হাসি একটু দ্বিধা করে বলে—না না।

—তবে কী করেছিল ?

একটা দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিল। তাতে বার বার একটা প্রশ্ন করেছিল—আমার কী দোষ ? আমাদের অপরাধ কী ? অপনি কেন এমম করলেন ? আরো লিখেছিল, যদি কখনো নিজের ভুল বুঝতে পারি তবে যেন তাকে জানাই, সে সারাজীবন অপেক্ষ্য করবে, নিঃশর্তে গ্রহণ করবে আমাকে···জামাইবাবু, আপনি কি শুনছেন ? আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস-ও যে শোনা যাচ্ছে না।

—শুনেছি। বল

—সে এই কথা লিখেছিল। আরো লিখেছিল, তাদের কালাশৌচের মধ্যেই যে তারা আমাকে আশীর্বাদ করে রেখেছিল সেটাও তারই আগ্রহে। তার ভয় ছিল, আশীর্বাদ করে না রাখলে ঐ সময়ের মধ্যে আর কেউ এসে আমাকে বিয়ে করে ফেলবে। তখন শিলচরে আমার স্যুটার অনেক, ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি পেতুম···শুনছেন ?

—শুনছি।

—কালো হলেও তো আমি সুন্দরী-ই। তার ওপর দারুণ নাচতাম, গাইতাম। আমার পায়ে পুরুষদের মাথা নুপুরের মত বাজত।

ও-পাশে জামাইবাবু বহুক্ষণ শ্বাস ধরে রেখে আবার অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস ছাড়ে। হাসি হাসে।

—কিছু বুঝলেন জামাইবাবু ?

—বুঝলাম।

—কী ?

—তুমি আর ফিরবে না হাসি।

ও-পাশে জামাইবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। হাসি অপেক্ষা করে।

—হাসি, স্টীমারঘাটটা সাবধানে পার হয়ো। ও জায়গাটা ডেঞ্জারাস।

হাসি চমকে উঠে বলে—স্টীমারঘাট ! কোন স্টীমারঘাট ?

—বাঃ, ফারাক্কায় তোমাকে ঘাট পেরোতে হবে না ?

—ওঃ। বলে স্তব্ধ হয়ে থাকে হাসি।

—একা যাচ্ছ, আমরা চিন্তায় থাকব। ওপারে বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেসে তোমার রিজার্ভেশন আছে, ভুল করে দার্জিলিং মেলে উঠো না।

—ভুল ট্রেনে ওঠাই কি আমার স্বভাব জামাইবাবু ?

জামাইবাবু একটু চুপ করে থেকে বলে—ভুল ট্রেনের কথা বলছ হাসি ! কিছু ইঙ্গিত করছ কি ? তবে বলি, আমাদের আমলে ভুল ট্রেনে উঠলেও শেষ পর্যন্ত যেতে হত। হয়তো ভুল জায়গায় গিয়ে পৌছাতাম। কিন্তু তবু যেতে হত। তোমাদের আমল আলাদা। তোমরা ভুল ট্রেন বুঝতে পারলেই চেন টেনে নেমে পড়তে পার।

—আমরা ভগ্যবান।

—দেখা যাক। আমি আরো কিছুদিন বাঁচব হাসি।

হাসি হাসে।

—এখোনো সাত আট দিন সময় আছে, এ ক'দিন কী করবে হাসি ?

—কী করব ! ঘুরব, ঘুরে বেড়াব।

—কোথায় যাবে ?

—কোথাও না। কলকাতা—কেবল কলকাতায় ঘুরব—ইচ্ছেমত।

—কলকাতায় আর কোথায় ঘুরবে, কী আছে কলকাতায়?

—কী আছে? কী জানি! আমি তো বিশেষ কোথাও যাব না। আমি ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায়। রঙীন দোকান দেখব আলো দেখব, পার্কে বসে থাকব কলকাতা পুরানো হয় না।

—কলকাতায় তুমি কী পেয়েছ হাসি?

কী পেয়েছি! হাসি তা ভেবে পায় না। সে চোখ বুজে থাকে মনে মনে বলে—কলকাতা! কলকাতা আমার প্রেমিক। জ্বলন্ত এক পুরুষ কলকাতা। সে আমাকে সব সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে টেনে এনেছিল, সুখী হতে দেয়নি। সে আমাকে নিয়ে আরো কত খেলা খেলবে, তোমরা দেখো।

—হাসি, ফোন কি ছেড়ে দিয়েছ?

—না তো।

—তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসও যে শোনা যাচ্ছে না।

—শুনছি। বলুন।

—এ কয়দিন অমিয়কে সঙ্গে নিয়ে ঘুরো।

—ও-মা! ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরব না কেন? এইতো ওর পিতুতো বোনের বিয়েতে যাচ্ছি একসঙ্গে। ওর স্কুটারে বহুদিন চড়িনি। ভাবছি ওর স্কুটারের পিছনে বসে এ-ক'দিন ঘুরে বেড়াব। অফিস-পাড়া, কলেজ স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীটের রেস্টরেণ্ট দেখে বেড়াব দুজনে। জামাইবাবু, আপনি কি ভাবছেন আমার প্রেজুডিস আছে? একদম নেই। আমরা দুজনে কথা বলি, হাসি-ঠাট্টা করি, কখনো ঝগড়া করি না। এমন কি মাঝে মাঝে এক বিছানায়···জামাইবাবু, শুনছেন?

—কী ভয়ঙ্কর!

—কী?

—তোমার নিষ্ঠুরতা।

মাথা আস্তে আস্তে পিছনে হেলিয়ে দিচ্ছিল হাসি। ক্রমে পিঠ

ঝেঁকে গেল পিছনে, মাথা প্রায় স্পর্শ করল পিঠ। কত উঁচু বাড়ি! উঠে গেছে তো উঠেই গেছে। কী বিশাল বাড়িটার বুক, কী পাথুরে গড়ন! দেখতে দেখতে নেশা ধরে যায় হ্যারিংটন স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটার ঠিক পায়ের তলা থেকে চুড়া দেখার চেষ্টা করল হাসি। তার মুখে ঘাম জমে গেল বেদনায়।

—বাব্বাঃ! আপনমনে বলল সে। হেসে আঁচলে একবার মুখ মুছে নিল। কলকাতার প্রোথিত ইমারত চারদিকে, তার মাঝখানে নিজেকে ধূলিকণার মত লাগে তার। কান পাতলে—পাতালের খরস্রোতা নদীর গর্জনের মত উতরোল কলকাতার গম্ভীর শব্দ শোনা যায়। কী রোমাঞ্চ জাগে শরীরে! কলকাতা—তার চারদিকে উষ্ণ কল্লোলিত কলকাতা!

হাসি পায়ে পায়ে পার হয় রাস্তা। ময়দানের দিকে ট্রামলাইন পেরোলে দেখা যায়, সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এলোমেলো পড়ে আছে—যেন বা যে খুশী নিয়ে যেতে পারে। ঘনপত্র গাছের ছায়া। পাতা ঝরে পড়ছে। পাখিরা ফেলে দিচ্ছে কুটোকাটা। নিবিড় ছায়া এখানে। পায়ের নীচে ঘাস, পাতা। নির্জনতা। হাসি পায়ে পায়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটে। কিছুই দেখে না, অথচ সবকিছু অনুভব করে তার সর্বগ্রাসী মন।

সামনেই একটা কালো হেরাল্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নতুন চকচকে গাড়ি। গাড়ির বনেটে হাত রেখে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে ফর্সা, মজবুত চেহারা, লম্বা জুলপী, ঘন বড় চুল, চৌকো মুখ। রঙীন চৌখুপওলা শার্ট তার পরনে, আর জলপাই-রঙা সরুচাপা প্যান্ট, পায়ে চোখা জুতো, কোমরের চওড়া বেল্টের বক্‌লশে একটা ইস্পাত রঙে ইংরিজি 'ডি' অক্ষর ঝলসে ওঠে। কবজীর ঘড়িতে মোটা সোনারঙেব চেন। মানুষটা হাসিকে দূর থেকেই লক্ষ্য করে। অন্যমনে একটা ঘাসের ডাঁটি তুলে আলস্যভরে চিবোয়। হাসি এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে। সেই হাঁটা দেখে লোকটা। দেখে তার পোশাক, মুখশ্রী, তার

বুক, চোখ। চোখেই বেশী লক্ষ করে। চেয়ে থাকে। একটা লক্ষণ খুঁজে দেখে। বোধহয় লক্ষণটা মিলে যায়। মিলিয়ে লোকটা হাসে। একটু বড় এবং মসৃণ দাঁত তার। ধারালো। হাসির একটু ভয় করে না। সে এগোতে থাকে। লোকটা হাসে। হাসি এগোয়। হেরাল্ড গাড়িটার গায়ের পালিশে হাসির ছায়া পড়ে। লোকটা বনেট থেকে হাতের ভর তুলে নেয়। ঝুলে পড়া শার্ট, কোমরে গুঁজে এক পা এগিয়ে আসে। আর এক পা। আর এক পা এগুলেই হাসির পথ আটকাতে পারে, ছুঁয়ে ফেলতে পারে হাসিকে। ডাক দেয়—মিস—ও মিস—

হাসি ছেলেটার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসে। প্রশ্রয়ের হাসি। ছেলেটা লক্ লক্ করে ওঠে লোভে। দাঁতাল হাসি হাসে বেল্টের 'ডি' অক্ষরটা ঝলসায়। ভাঙা গলায় ডেকে বলে—আই হ্যাভ এ কার মিস—

হাসি বড় বড় চোখে ছেলেটাকে দেখে। ছেলেটা টেরও পায় না, ঠিক তার পিছনেই উদ্যত আঠারো তলা উঁচু এক হিংস্র ইমারত। সেই ইমারতের সামনে তাকে কত তুচ্ছ, এইটুকু পতঙ্গের মত দেখায়। হাসি সেই ইমারতের ফ্রেমে ছেলেটার ক্ষুদ্রতা মাত্র একপলক অবাক হয়ে দেখে। ছেলেটা ঝুঁকে ফিস ফিস করে কী যেন বলে। অমনি ময়দান থেকে মার মার করে ছুটে আসে বাতাস, তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যায়। হাসির করুণা হয়। তার প্রেমিক কলকাতা চারদিকে জেগে আছে সহস্র চোখে। উদাসী, নির্মম, আবার ঈর্ষায় কাতর। যদি ইঙ্গিত করে হাসি তবে অমনি তার প্রেমিক কলকাতা পিছনের ঐ আঠারোতলা বাড়িটার চূড়া হয়ে মড় মড় করে ভেঙে পড়বে ছেলেটার মাথায়। গুড়ো করে মিশিয়ে দেবে মাটিতে। কিন্তু ইঙ্গিত করে না হাসি। শুধু মুখটা ফিরিয়ে নেয় অবহেলায়। একা একা ঘোরে-বলে এরকম কত মানুষ কতবার তার পিছু নিয়েছে, ডাকাডাকি করছে ইঙ্গিতে কীটপতঙ্গের মত সব ছোট মাপের জীব।

কলকাতায় গায়ে উড়ে এসে বসে আবার উড়ে যায়।

হাসি হাঁটতে থাকে। কত দূর দূর হেঁটে যায় হাসি। কখনো ট্রামে ওঠে। কিছুদূর যায় আবার নেমে পড়ে। ধ্বংসাবশেষ দুর্গের শেষ একটিমাত্র স্তম্ভের মতো মনুমেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখে। দেখে, গঙ্গার কোল জুড়ে শুয়ে আছে হাওড়ার পোল। তার চোখের পাশ দিয়ে ভেসে যায় ভাঙা টুকরো সব দৃশ্যাবলী, ছায়া পড়ে, ভেঙে যায়। চকিতে মানুষের চোখ ঝলসে ওঠে। কানাগলির মুখ সরে যায়। গভীর গভীর অগাধ কলকাতার ভিতর হারিয়ে যায় হাসি। ভোগ-বতীর গম্ভীর নিনাদের মত কলকাতার কত শব্দ হয়।

জাহাজঘাট। হাসি থমকে দাঁড়ায়। মাস্তুল। জল। না এখানে নয়। এ তো কলকাতা থেকে বিদায়ের বন্দর। এর অর্থ তো ছেড়ে যাওয়া। মাস্তুল অদৃশ্য রুমাল উড়িয়ে বিদায় জানায়। জাহাজ ভেসে যাবে দূর সমুদ্রে। হাসি ফিরে দাঁড়ায়। এখানে নয়, এখানে নয়। এখানে কলকাতার শেষ। জীবনের শেষ, এখানে অচেনার সরু। হাসি ফিরে আসে।
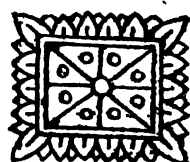
সেনগুপ্ত নিয়ে গেছে অনেক। হিসেব করলে কত দাঁড়াবে তা ভেবে দেখেনি অমিয়। হিসেব করা সে প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। ক্যাপিটাল শেয়ার আর সেই সঙ্গে লাভাংশ মিলে একটা বেশ বড় অঙ্কের টাকা। অমিয় আটকাতে পারেনি। কিন্তু তবু সেটা কিছু নয়। সেনগুপ্ত বা তার টাকা কোনোটার অভাবেই ব্যবসা অটকাত না। যদি অমিয় খাড়া থাকত। তারতরে তাজা জোয়ান বয়সের মানুষের কাছে এ আবার একটা সমস্যা ছিল নাকি! ছিলনা—অমিয় তা জানে, কিন্তু সে কেমনধারা মেঘলা মানুষ হয়ে গেল। দিন না ফুরতেই আলো মরে গিয়ে ঘনিয়ে এল দিনশেষ!

দুপুরে অমিয় আজকাল কিছুই খায়না। লাঞ্চ সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। কল্যাণ বা রজত সবাই এ সময়টায় বাইরে থাকে, পাঞ্জাবী হোটেল বা গাঙ্গুরামে টিফিন সারে। ডিউক রেস্টরেন্টে নতুন একটা আড্ডা হয়েছে কল্যাণের। সেখানে সারাটা দুপুর কাটায় কখনো কখনো। অমিয় একসময়ে যেত। এখন টিফিনের সময়টায় বসে থাকে চুপচাপ। রাজেন এক কাপ চা রেখে যায় না বলতে। আজ চায়ের সঙ্গে একটা শালপাতার ঠোঙায় কয়েকটা দেওঘরের প্যাঁড়া রেখে গেছে। কোন ভাই যেন এনেছে দেশ থেকে।

চা টা খেল অমিয়, প্যাঁড়া ছুঁতে ইচ্ছে করলনা। পেটে খিদে মরে একটা গুলিয়ে ওঠা ভাব। সবাই তাকে লক্ষ্য করে আজকাল। সে যে খায়নি, সে যে বিপাকে পড়েছে। ভাবতে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসে। রাত্তিরে অফিস বাড়িটা ফাঁকা থাকে। তখন রাজ্যের দেশওয়ালী মুটে মজুর রিক্সা বা ঠেলাওয়ালাকে এখানে এনে তোলে

রাজেন। এক রাত্রির বসবাসের জন্য মাথাপিছু দুচার আনা করে নেয়। তারা দিব্যি ফ্যানের হাওয়া খায়। অনেক রাত অবধি বাতি জ্বেলে গল্পসল্প করে। মাসের শেষে মস্ত অঙ্কের ইলেট্রিক বিল আসে। তাই রাজেনকে তার সাইড বিজনেসের জন্য বিস্তর বকারকি করেছে অমিয়, কল্যাণ আর রজত। সেই খারাপ ব্যবহারটুকুর জন্য এখন প্যাঁডাগুলির দিকে চেয়ে একটু বুকটা টন্ টন্ করে। রাজেন আজ কাল না বলতেই টিফিনের সময়ে কোন কোনদিন একঠোঙা মুড়ি বাদাম হাতের কাছে রেখে যায় নিঃশব্দে। এ সবই সহৃদয়তার নিদর্শন। কিন্তু অমিয়র ভিতরটা জ্বালা করে।

দুপুরের দিকে পিসেমশাই ফোন করলেন।

—অমিয়, আমি সেদিন তোর বাসায় গিয়েছিলাম। রেখার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে রে!

—শুনেছি পিসেমশাই, পাত্র কেমন?

—খুব ভাল। টাটার ইঞ্জিনীয়ার, তবে দাবী দাওয়া অনেক।

অমিয় একটা শ্বাস ছাড়ল। পিসেমশাই আবার বললেন—মেয়েটার সুন্দর মুখ দেখে পছন্দ করেছে, নইলে গরীব ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ করার মতো পাত্র তো নয়।

—পিসেমশাই আপনার কত দরকার?

পিসেমশাই লজ্জিত হন বোধহয়। একটু নীরব থাকেন। তার পর আস্তে করে বলেন দরকারের কি শেষ আছে অমিয়! প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা যা অবশিষ্ট ছিল সবই প্রায় তুলেছি। কিছু ধার কর্জ করেছি। এখনো দু তিন হাজার কম পড়বে। আলমারীটা এখনো কেনা হয় নি, সোনার দোকানেও যা আন্দাজ করেছিলাম তার বেশী পড়ে গেল!

—ঠিক আছে, আমি হাজার খানেক দেবো।

দিতে তোর কষ্ট হবে না তো?

কষ্ট কি পিসেমশাই? রেখার বিয়েতে আমার তো দেওয়ার

কথাই ছিল। পিসেমশাই হাসলেন ফোনে। বললেন—কথা দিয়েছিস বলেই আবার কষ্ট করে দিস না।

অমিয় একটু আহত হল। সে দিতে পারবেনা—এমন যদি কেউ ধরে নেয় তবে তার আহত হওয়ারই কথা।

সে একটু নীচু স্বরে বলল—পিসিমা বেঁচে থাকতে, সেই কবে ছেলেবেলায় আমি পিসিমাকে প্রায় সময়েই বলতাম, রেখার বিয়ে অমি দেবো, সে কথা তো রাখতে পারলামনা পিসেমশাই।

পিসিমার উল্লেখে পিসেমশাই নীরব হয়ে গেলেন। অনেকটা পরে যখন কথা বললেন তখন টেলিফোনেও বোঝা গেল, গলাটা ধরে গেছে।

বললেন—তা হোক, ছেলেবেলায় মানুষ কত কী বলে। যা দিতে পারিস দিস।

—আচ্ছা পিসেমশাই।

—শোন, বৌমাকে বিয়ের দুএকদিন আগে আমাদের এখানে পাঠাতে পারবিনা? বিয়ের কাজকর্ম, মেয়েছেলে ছাড়া কে বুঝবে!

হাসিকে বললে হাসি রাজী হবে কিনা তা কে জানে! তাই অমিয় উত্তরটা ঘুরিয়ে দিল—সেদিন যখন গিয়েছিলেন তখন নিজেই তো বৌমাকে বলে আসতে পারতেন!

—লজ্জা করল। বৌমা তো আমাকে খুব ভাল চেনেন না, দু একবার মাত্র দেখেছেন, তুইও সাহেবী কায়দায় বিয়ে করলি, সামাজিক অনুষ্ঠান হলনা!

অমিয় লজ্জা পায়। বলে—তাতে কী?

—সামাজিক বিয়ে হলে সেই অনুষ্ঠানে সব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নতুন বৌয়ের চেনাচিনি হয়ে যায়। তোর বেলায় তো সেরকম হয়নি, তাই একটু দূরের মানুষ হয়ে আছি আমরা। তবে তোকে বলি অমিয়, বৌমা ভারী ভাল হয়েছে। পরিচয় দিতে কত যত্ন আত্তি করল। আজকালকার মেয়েদের মতো নয়।

অমিয় উত্তর দিলনা।

—অমিয়।

—বলুন পিসেমশাই।

পারিস তো বিয়ের আগে হাসিকে পাঠিয়ে দিস।

—দেখি।

দেখি টেকি নয়, এয়োর কাজ করার লোক নেই।

—আচ্ছা।

ছাড়ছি, বলে পিসেমশাই ফোন রাখলেন।

ফোনটা রেখে অমিয় তিন বুড়োর দিকে তাকালো, তিনজনই পাথর হয়ে বসে আছে। একেই কি স্থবিরতা বলে! তান্ত্রিক লোকটা একবার চোখ তুলে অমিয়র দিকে তাকায়, মাথায় জটা, কপালে মস্ত লাল একটা ফোঁটা, চোখ দুটোয় বেশ তীব্র চাউনী। হেসে এবং তাকিয়ে হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলল—টাকা!

অমিয় হাসে। উল্টো দিকের দুই বুড়ো খুব আগ্রহের সঙ্গে তান্ত্রিকের দিকে ঝুকে বসল, বাবা যদি এবার কিছু বাণী দেন!

অমিয় মাথা নেড়ে বলল—টাকা।

তান্ত্রিক তার দুই ভক্তের দিকে চেয়ে আস্তে করে বললে—টাকা।

ভক্ত দুজন কী বুঝল কে জানে। জুল জুল করে চেয়ে থাকে।

অফিসঘরে এসে অমিয় ফাঁকা ঘরটার চারদিকে চাইল। কেউ নেই। কাগজপত্র হাওয়ায় নড়ে শব্দ করছে। পুরোনো ফ্যান থেকে একটা ঘট ঘটাং শব্দ উঠছে।

কিছুক্ষণ বসে থাকল অমিয়। রেখার বিয়ে, এক হাজার টাকা দিতে হবে।

অমিয় বেরিয়ে এল।

স্কুটারটা এখনো তার আছে। বেশীদিন থাকবে না। কল্যাণকে সে দিয়ে দিয়েছে, যতদিন ও না নেয় ততদিন তার। আহমদ একটা মফঃস্বলের লোককে জাঙ্গিয়া গতানোর চেষ্টা করছে। অমিয়কে

দেখে নিশব্দ গলায় বলল—সাহা ব্রাদার্স থেকে লোক এসেছিল তাগাদায়, হটিয়ে দিয়েছি। আবার তিনটের পর আসবে।

অমিয় উত্তর না দিয়ে গিয়ে স্কুটার চালু করে।

যে ব্যাঙ্কে অমিয়র অ্যাকাউন্ট আছে তা অনেকটা তার ঘরবাড়ির মতো হয়ে গেছে, বহুকাল ধরে একই ব্যাঙ্কে সে টাকা রাখছে, তুলছে, চেক বা ড্রাফ্‌ট্‌ ভাঙাচ্ছে। সবাই মুখ চেনা হয়ে গেছে। কেউ কেউ একটু বেশী চেনা। এবং একজনের সঙ্গে পরিচয় আরো একটু গভীর।

ব্যাঙ্কের বাইরে স্কুটার রেখে অমিয় ভিতরে আসে। সোনাদার ব্যাঙ্ক যেমন বড়, আর হালফ্যাশানের এ ব্যাঙ্কটা তেমন নয়। প্রাইভেট আমল থেকেই এর মলিন দশা, কাউন্টারের পুরোনো কাঠ গাঢ় খয়েরী রং ধরেছে, দেয়ালের রং বিবর্ণ, কাঠের পার্টিশন গুলো নড়বড় করে।

কারেন্ট অ্যাকাউন্টটা অমিয় বহুদিন হল বন্ধ করে দিয়েছে! সেভিংসে কিছু টাকা থাকা সম্ভব, পাশবইটা বহুকাল এন্টি করানো হয়নি। কত টাকা আছে কে জানে!

টোকেন ইস্যু করার কাউন্টারে একসময়ে নীপা চক্রবর্তী বসত। ভিতরের দিককার একটা ঘরে বসে আপনমনে কাজ করে। পাবলিকের সামনে আর থাকে না!

কাউন্টারের মেয়েটি ফোর ওয়ান নাইন নাইন অ্যাকউন্ট লেজার খুলে দেখে বলল—না, হাজার টাকা তো নেই। দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা আছে।

অমিয় যন্ত্রের মত শব্দ করে—ও।

আরো দুটো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে অমিয়র। কিন্তু সেখানে আর যাওয়ার আগ্রহ হয় না। খুব বেশী নেই। যা আছে তাতে হাত দেওয়া যায় না। হাসি চলে যাবে। অনেক পেমেন্ট বাকী। একটা হতাশা ভর করে তাকে। মুখটা বিস্বাদ। খালি পেটে সম্ভবতঃ পিত্ত পড়েছে। মাথার মধ্যে একটা রিমঝিম। চোখের সামনে একটু অন্ধকার, অন্ধকারে উজ্জ্বল কয়েকটি তারা খেলা করে মিলিয়ে গেল। দুর্বলতা

থেকে এরকম হয়।

তুটো বাজতে আর খুব বেশী দেরী নেই। বেলা তুটোয় সব জায়গায় টাকা পয়সার ওপর ঝাপ পড়ে যায়।
ভিতরের দিকে একটা করিডোর গেছে। ওদিকে একটা বাইরে যাওয়ার দরজা আছে। ব্যাঙ্কের সামনের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে ওদিক দিয়ে যাতায়াত করে লোক। ব্যাঙ্ক আওয়ারের পরে এসেও বহুদিন ঐ দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে অমিয়, চেক ক্যাশ করে নিয়ে গেছে। নীপা চক্রবর্তী ঐটুকু ভালবাসা দেখাত।

তুশো পঁয়ত্রিশ টাকায় হাত দিলনা অমিয়। থাকগে। সে করিডোর ধরে ভিতরের পার্টিশনের কাছে এসে দাঁড়ায়। কাঠের পার্টিশনে কাচ লাগিয়ে বাহার করার চেষ্টা হয়েছে। ময়লা ঘোলা কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যায়। লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর ঝুঁকে কয়েকজন কাজ করছে। তৃতীয়জন নীপা। শ্যামলা রং রোগা শরীরে ইদানিং একটু মাংস লেগেছে। মুখখানা নোয়ানো বলে ভাল দেখা যায় না। কিন্তু অমিয় জানে মুখখানা ভালই নীপার। টসটসে মুখ বলতে যা বোঝায় তাই। বড় বড় তুখানা চোখ ভরে একটা নরম সৌন্দর্য ছড়িয়ে থাকে। চোখে কাজল দেয় নীপা, কপালে টিপ পরে, সাদা খোলের শাড়ি পরে বেশীর ভাগ সময়ে। রঙীন পরলে হাল্কারঙা। গায়ের রং চাপা বলে চড়া সাজ কখনো করেনা। তাতে ও ফুটে ওঠে বেশী।

অমিয়র সঙ্গে নীপার এমনিতে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

চেক জমা দিয়ে টোকেন নেওয়ার সময়ে, বা অ্যাকাউন্টের টাকার অঙ্ক জানতে এসে, মুখোমুখি একটু বেশীক্ষণ কি দাঁড়াত অমিয়?

চোখে চোখ পড়লে সহজে চোখ সরাত না বোধহয়? মাঝে মাঝে একটু আধটু হাসত কি? সে যাই হোক, তাদের চেনাজানা ছিল খুব সহৃদয়তায় ভরা। অনুভূতিশীল। ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের পরে এসে অমিয় বলত—একটু জ্বালাতে এলাম।

নীপা মৃত্থ অহংকারী হাসি হেসে বলেছে—কে না জ্বালায়! জ্বলে

যাচ্ছি। দিন কি আছে…বলে হাত বাড়িয়ে চেক নিত।

রোগা মেয়ে পছন্দ করত অমিয়। মোটা বা বেশী স্বাস্থ্যবতী তাঁর পছন্দের নয়। নীপা রোগা ছিল, আবার রুগ্নও নয়। বুকের স্নিগ্ধ ফল দুটি মুখ তুলে চেয়ে থেকেছে পুরুষের দিকে। কনুই বা কব্জীর হাড় তেকোনা হয়ে চামড়া ফুঁড়ে উঠে থাকতনা। শরীরের চেয়ে অনেক আকর্ষক ছিল গলার স্বরে নম্রতা। অমিয় ছাড়া আর কাউকে কখনও নীপা ঠাট্টা করে কথার উত্তর দিয়েছে এমনটা অমিয় দেখেনি। খুব সিরিয়াস ভাবে কাজ করত। মেয়েরা অফিসের কর্মচারী হিসেবে বেশীর ভাগই ভাল হয় না। যেখানে তিনচারটে মেয়ে জোটে সেখানে কাজ হওয়া আরো মুস্কিল। কিন্তু নীপা ছিল অন্যরকম। শনিবার যখন প্রচণ্ড রাশ হয়, কিংবা কোনো ছুটির আগে যখন টাকা তোলার ধূম পড়ে যায় তখনো নীপাকে বরাবর নীচু গলায় লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে অমিয়, দেখেছে মুখে স্নিগ্ধ হাসি, অবিরল ব্যস্ততার মধ্যেও নানা লোকের অপ্রয়োজনীয় বোকা-প্রশ্নের উত্তর দিতে। একদিন দুজন অল্পবয়সী ছোকরা স্রেফ ইয়ার্কী দিতে ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়েছিল। তারা উইথড্রয়াল স্লিপ নিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা লিখে জমা দিয়ে টোকেন নিল। ব্যাপারটা ধরতে দু মিনিটের বেশী লাগেনি নীপার। লেজার বইটা খুলে অ্যাকাউণ্ট দেখে যখন, তার উচিত ছিল দারোয়ান ডেকে ছোঁড়া দুটোকে বের করে দেওয়া, তখনও সে বিনীত-ভাবে তাদের ডেকে বলেছিল—সইয়ে যে নাম লিখেছেন তার সঙ্গে অ্যাকাউণ্টের নাম মিলছেনা। ছোড়া দুটো সাহস পেয়ে আরো কিছু ইয়ার্কী দেয়, একজন বলে—তাহলে অ্যাকাউণ্ট খুলব। ফর্ম দিন। নীপা আশ্চর্য, ধৈর্য ধরে রেখে ওদের ফর্মও দিয়েছিল যেটা ওরা কিছুক্ষণ কাঠাকাটি করে ছিঁড়ে ফেলে চলে যায়। দৃশ্যটা অমিয়র চোখের সামনে ঘটে। নীপা স্বাভাবিক হাসি হেসে বলেছিল তাকে —এরকম প্রায়ই হয়। আমরা কিছু মনে করি না।

তখনো হাসির সঙ্গে দেখা হয়নি। এ হচ্ছে প্রাক্-হা'সতিক

ঘটনা। তখন অমিয় মাঝে মাঝে নীপার কথা ভাবত বিরলে। মনে-পড়া শুরু হয়েছিল, ভাবতে ভাল লাগত। ঘন ঘন তখন ব্যাঙ্কে যাওয়ার দরকার পড়ত তার। রাজেন বা সেনগুপ্তকে পাঠালেও যখন কাজ চলে তখনও সে নিজেই যেত। নীপা যেদিন আসত না সেদিন ক্ষুণ্ণ হত সে। পরদিন এলে অনুযোগ করত—কাল আসেননি কেন? কাল আমার পেমেণ্ট পেতে অনেক দেরী হয়েছে।

নীপা সে অনুযোগের সহৃদয় উত্তর দিত। বলেছে—রোজ তো আসি। এক আধদিন না এলে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। যন্ত্র তো নই।

এ ধরনের কথা নীপা একমাত্র তার সঙ্গেই বলত এবং তখন চোখে চোখে মানুষের গভীর হৃদয় গোপন বার্তা পাঠাত না কি।

ব্যাঙ্কের বাইরে দেখা হয়েছিল মোটে একদিন। গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রীটের একটা দোকানে নীপা পূজোর জামাকাপড় কিনতে ঢুকেছিল। অফিসের পাড়া। অমিয় ডাব খাচ্ছিল পাশের পানের দোকানটায়। নীপা দেখেনি। অমিয় ভিতরে ঢুকে নীপাকে ধরল—এই যে!

নীপার সঙ্গে অফিসের আরো দুটি মেয়ে ছিল। তারা একটু ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে দেখল অমিয়কে। নীপারই ভ্রূ সহজ ছিল। মুখে হাসি ফুটল সেই সহৃদয়তার। অনেক কিছু এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলতে পারত। কিন্তু খুব আন্তরিক লাজুক গলায় একটা ঘন নীল পাছা পেড়ে শাড়ি তুলে দেখিয়ে বলল—দেখুন তো, এটা অদিতিকে মানাবে না? অদিতি সঙ্গী মেয়েদের একজন। ফর্সা। অমিয় হেসে বলে—নীল শাড়ি সবাইকে মানায়।

যতক্ষণ শাড়ি কিনেছিল ওরা ততক্ষণ নীপা চোখের শাসনে আটকে রাখল অমিয়কে। অমিয় যতবার বলে—এবার যাই, কাজ আছে। ততবার নীপা বলে—দাঁড়ান। মেয়েরা ঠিক ঠিক শাড়ি পছন্দ করতে

পারে না। পুরুষেরা অনেকে পারে। আমাদের শাড়ি পছন্দ করা হয়ে গেলে যাবেন।

শাড়ি কেনা হলে সঙ্গিনীরা চলে গেল। বোধহয় একটা ষড়যন্ত্র করেই। নীপা একা হয়ে বলল—এবার আমাকে সাউথের বাসে তুলে দিন তো।

অমিয় তার স্কুটার দেখিয়ে বলে—বাসের দরকার কী! যদি সাহস থাকে তো উঠে পড়ুন। পৌঁছে দিয়ে আসি।

—ও বাবা! স্কুটার! পড়ে টড়ে যাবো, কখনো চড়িনি।

অবশেষে উঠেছিল নীপা স্কুটারেই। মাঝপথে একটা রেস্টরেন্টে চা খেয়ে নিয়েছিল তারা। অনেক কথাও হয়েছিল। এলোমেলো কথা। আর কথার মাঝখানে লজ্জার সঙ্কোচের এবং আকর্ষণের ঝাপটা এসে লাগছিল। মাঝে মাঝে কথা বন্ধ হয়ে যায়। নীরবতা নৈকট্যকে অদ্ভুতভাবে টের পায় তারা।

শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয়নি। টালিগঞ্জের খাল পাড় পর্য্যন্ত নীপাকে পেঁৗছে দিল অমিয়। তারপর সিগারেট জ্বেলে থেমে থাকা স্কুটারে বসে দেখল। নীপা নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে ওপাড়ে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে অনেকবার পিছু ফিরে চেয়ে দেখল তাকে। মুখটায় স্মিত গভীর একটা বিশ্বস্ততা।

না, কিছু হয়নি শেষ পর্য্যন্ত। হয়ত হতে পারত। মাঝপথে হাসি এসে সব তছনছ করে দিল। তুলে নিল তাকে। নিল, আবার নিলও না। বড়ঘরের মেয়েরা যেমন নিত্য নূতন জিনিষ কিনে সেসব জিনিষের কথা ভুলে যায় দুদিন পর। অবহেলায় ফেলে রেখে দেয়। তেমনি অমিয়কে কবে ভুলে গেছে হাসি।

ঘোলা ময়লা কাচের ভিতর দিয়ে কয়েক পলক চেয়ে থাকে অমিয়। নীপা টের পায়। মুখ তোলে।

অমিয় একটু হাসে। নীপাও একটু হাসে। ওর সিঁথিতে সিঁদুর। হাসিটা তেমনি সদস্ত্রয়তায় ভরা। দেখে ভিতরে একরকম

ছুঁচ ফোটার যন্ত্রনা হয়। ঘোলা ময়লা কাচের ভিতর দিয়ে প্রায়ান্ধকার করিডোরে দাঁড়ানো অমিয়কে চিনতে পেরেছে নীপা। চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে উঠে এল।

—কী খবর? আবার বুঝি জ্বালাতে এসেছেন? নীপা করিডোরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে।

অমিয় মাথা নাড়ল। বলল—না। কোনদিন আপনাকে কাজ ছাড়া দেখিনা। আজও দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

—কাজের জায়গায় দেখা হলে কাজ-ছাড়া কী করে দেখবেন?

অমিয়র এখন আর সাহসের অভাব হয় না। সে বলে—অকাজের জায়গায় কেমন দেখাবে কে জানে!

আশে পাশে ব্যস্ত সমস্ত লোকেরা যাচ্ছে আসছে। নীপা বলে—বলুন না বাবা কী কাজ আছে! কোনো চেকের ক্লিয়ারেন্স আসেনি না কি!

—ওসব নয়। অ্যাকাউণ্টে টাকাই নেই। চেক জমা দিইনা অনেকদিন।

—সে তো জানি।

—কী করে জানলেন?

—আপনার অ্যাকাউণ্টটা দেখি মাঝে মাঝে। আজকাল কেবল উইথড্রয়াল হচ্ছে, জমা পড়ে না। কী ব্যাপার?

অমিয় একটা শ্বাস ফেলে। মাথা নেড়ে বলে—আপনি আমাকে মনে রেখেছেন।

—মনে রাখব না! ব্যাঙ্কের সব ক্লায়েণ্টকে আমার মনে থাকে।

বানানো কথা। মিথ্যে।

অমিয় একটা বিষ বোলতার কামড় খায় এই কথায়। বলে—কোন পক্ষপাত নেই, না?

নীপার মুখে একটু দুঃখের ছায়া খোঁজে অমিয়। পায় না। হাসিকে বিয়ে করার পর মাস দুই বাদে নীপার বিয়ে হয়। কেউ

কাউকে নিমন্ত্রণ করেনি। জানায়ওনি। কিন্তু জানাবার দরকার হয় না। অমিয় তখন বিয়ের পর দেদার টাকা ওড়াত। হাসিকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে নিয়ে আসত ব্যাঙ্কে। টাকা তুলত, আর টোকেন নিয়ে অপেক্ষা করার সময়ে কলকলাত দুজনে। সেসব কি দেখেনি নীপা? তেমনি আবার দুমাস বাদে নীপার সিঁথিতে সিঁদূর দেখেছে অমিয়। কেউ কাউকে প্রশ্ন করেনি। জেনে গেছে।

নীপার মুখে তাই কোনো দুঃখের ছায়া নেই। কিন্তু তবু সে কেন অমিয়র অ্যাকাউণ্টের খবর রাখে?

অমিয় বলে—আপনার টিফিনের সময় হয়নি?

—হয়ে গেছে। কেন?

হতাশ অমিয় বলে—হয়ে গেছে! আমি ভাবছিলাম আজ আপনাকে খাওয়াবো।

—তাই বা কেন! কোনো খাওয়া কি পাওনা হয়েছে! নীপা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে হাসল।

অমিয় মাথা নেড়ে বলল—খাওয়ার জন্য নয়।

—তাহলে?

অমিয় বুঝল, নীপার সঙ্গে আসলে তার কোনো বোঝাবুঝি তৈরী হয়নি। এমন অধিকার তার নেই যে সে ইংগীতে ডেকে নিয়ে যেতে পারে বিশ্বস্ত নীপাকে। এখন তার উচিত হবে ভদ্রতাসূচক দু একটি কথা বলে চলে যাওয়া।

কিন্তু চলে যেতে পারে না অমিয়। আস্তে করে বলে—আপনি মিস চক্রবর্তী ছিলেন, এখন কী হয়েছেন?

নীপা একটু তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বোধ হয় মনে মনে বলে—আর যাই হই, বাগচী হইনি। তাকিয়ে থেকে নীপা মৃদুস্বরে বলে—আমার বুঝি কাজ নেই! কী দরকার বললেই তো হয়।

—আমার জানা দরকার, আপনি চক্রবর্তী ছেড়ে কী হয়েছেন!

নীপা মৃদু হাসল বটে, কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে গেল একটু। বলল—চক্রবর্তীদের অনেক গোত্র হয় জানেন তো। আমি চক্রবর্তী থেকে চক্রবর্তীই হয়েছি। গোত্রটা আলাদা। জেনে হবে কী!

—এমনি, কৌতূহল।

—আপনার চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে। আন অফিসিয়াল কথাটা বলে ফেলেই বোধহয় লজ্জা পায় নীপা। মুখ ফিরিয়ে বলে—চলি।

অমিয় মাথা নাড়ল, তারপর করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে ধীরে ধীরে। দরজাটার কাছ বরাবর এসে ফিরে তাকায়। নীপা দাঁড়িয়ে আছে।

অন্য মেয়ে হলে এই অবস্থায় চোখে চোখ পড়তেই পালিয়ে যেত। নীপা পালাল না। হাতটা তুলে তাকে থামতে ইংগীত করল। তারপর ঢুকে গেল ভিতরে।

অমিয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। অপেক্ষা করে, একটু বাদেই নীপা আসে। হাতে ব্যাগ, ছোটো ছাতা, মুখখানায় একটু রক্তাভা। কাছে এসে বলে—আজ ছুটি নিয়ে এলাম। বাড়ি যাবো।

অমিয় অবাক হয়। বলে—বাড়ি যাবেন?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন যে!

নীপা উত্তর দিল না।

রাস্তায় এসে তারা ঝিরঝিরে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। অদূরে অমিয়র স্কুটার। অমিয় স্কুটারটা দেখিয়ে বলে—আজ আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি। যাবেন?

মুখ নীচু করে নীপা মাথা নেড়ে বলে—না। রাধাবাজারে আমার স্বামীর ঘড়ির দোকান আছে। কাছেই। এখন ওখানে যাবো। সেখানে আমাদের গাড়ি আছে। তাতে ফিরব। এখন আমি নর্থ-এ থাকি। পাইকপাড়ায়।

—ও। অমিয় বুঝতে একটু সময় নেয়। নীপাকে ছাড়া নীপার আর কিছুই জানত না অমিয়। এখনো জানেনা। শুধু ঘড়ির দোকান। স্বামী। গাড়ি আর পাইকপাড়া শব্দ গুলো তার ভিতরে খুচরো পয়সার মতো হাত খসে পড়ে গিয়ে গড়াতে থাকে।

—আপনি কী যেন বলতে চেয়েছিলেন। বললেন না।

অমিয় কষ্টে হাসে। ঘড়ির দোকানে স্বামী। স্বামীর গাড়ি। আর গাড়িতে পাইকপাড়া—এ সবই খুব রহস্যময় লাগে তার কাছে। নীপার কেন স্বামী থাকবে। সে কেন স্বামীর গাড়িতে পাইকপাড়া যাবে। কেন সে আজও অমিয়র নিজস্ব জিনিষ নয়—তা ভেবে একধরনের ক্রোধ আর হতাশা মিশে যায় তার ভিতরে।

সে বলল-শুনুন।

—কী?

—আপনার সম্পর্কে কিছুই কোনদিন জেনে নেওয়া হয়নি।

নীপা মৃদু হেসে বলে—জানাটা কি দরকার ছিল?

—আমার সম্পর্কেও আপনি কিছু জানেন না।

—না। তবে আপনার বৌকে দেখেছি। খুব সুন্দর বৌ।

অমিয় স্থির চোখে নীপাকে চেয়ে দেখে। ঠিক। হাসি নীপার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। হাসিও কালো। নীপার মতোই। তবু হাসির মুখ চোখ, শরীরের গঠন অনেক উঁচু জাতের। নীপার হিংসে হতে পারে।

অমিয় মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে—আমরা কেউ কারো সম্পর্কে জানলাম না কেন?

নীপা এ কথার উত্তর দিলনা। কারন, এ বড় বিপজ্জনক কথা। উত্তর হয় না।

অমিয় বলল—স্কুটার থাক, চলুন আপনাকে রাধাবাজারের দিকে একটু এগিয়ে দিই। পথে বরং এক কাপ চা খেয়ে নেবো।

তারা হাঁটতে থাকে। নীপা মাথা নত রাখে। অমিয়কে সে যে

অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিচ্ছে সে বিষয়ে সচেতন। দূরত্ব বজায় রাখছে। বোধহয় ভয়ও পাচ্ছে মনে মনে। আবার বোধহয় চাইছেও, অমিয় তাকে কিছু বলুক।

—আজ এমন করছেন, কী হয়েছে আপনার? নীপা তার মস্ত চোখ তুলে হঠাৎ বলে।

আশ পাশ দিয়ে কলকাতার দৃশ্যাবলী মিলিয়ে যাচ্ছে ডাইলি-উশনে। রেলগাড়ির মতো দ্রুত বয়ে যাচ্ছে কলকাতা। সেই গতি-শীলতার মধ্যে তারা ধীরে হাঁটে। অমিয় বলে—আমার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট কী বলছে?

নীপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—ও।

আবার হাঁটতে থাকে তারা। ওল্ড কোর্টহাউস স্ট্রীট পার হতে হতে অমিয় বলে—আমি ভাল নেই নীপা।

নিজের নাম শুনে একটু চমকে ওঠে নীপা। চমকটা ঢাকা দিয়ে মৃদুস্বরে বলে—কেন? ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্টের কথা ভেবে?

না। অমিয় বলে—আমি তোমাকে ভালবাসতাম। কিন্তু সে কথা কখনো বলা হয়নি। এই অপরাধে।

নীপা ঠোঁট কামড়ায়। মাথা নত করে।

কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে। চারদিকে মানুষ আর মানুষের মধ্যে। প্রবল গাড়ির আওয়াজের মধ্যে এক নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ নেমে আসে।

অমিয় হঠাৎ দাঁড়ায়। ভিতরে বিষ বাষ্প জমে উঠেছে আজ।

নীপা তার দিকে মুখ তুলে তাকায়। দুটি চোখ বাঙ্ময়। কিছু বলতে চায়।

অমিয় আস্তে করে বলে—দেখা হবে। আবার।

—কোথায়?

অমিয় তেমনি আস্তে টরে-টক্কার মতো মৃদু লয়ে বলে—একটা স্টীমারঘাট আছে। সেই খানে সকলের দেখা হয়।

—কোথায়? নীপার কপালে ভাঁজ পড়ে।

—ধু-ধু গড়ানে বালিয়াড়ি বহুদূর নেমে গেছে। তারপর কালো গভীর জল। একটা ফাঁকা শূন্য জেটি। অথৈ জল। ওপরে একটা কালো আকাশ ঝুঁকে আছে। বালির ওপরে পড়ে আছে একটা সাপের খোলস। হাহাকার করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে সেখানে।

অবাক চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা।

অমিয় বলে দেখা হবে।

তারপর হেঁটে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল অমিয়।

নীপা খুব ধীরে ধীরে হাটে। ভাবে। মুখে কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা খেলা করে যায়। তারপর কখন যেন চোখ ভরে জল আসে। জলভরা চোখে চেয়ে দেখে। কলকাতা শহরটা কেমন ভেঙে চুরে গেছে। আবছা, অস্পষ্ট আর অলীক হয়ে গেল চারধার। অর্থহীন হয়ে গেল জীবন। বেলুনের মতো ফেটে গেল বাস্তবতা।

চোখের জল মুছে নেয় নীপা। ভুল রাস্তায় চলে যাচ্ছিল। সতর্ক হয়ে ফিরে এল সঠিক রাস্তায়। মানুষটা কেমন! খুব অদ্ভুত, না? ফের জল আসে চোখে। ওর অ্যাকাউন্টে মোটে দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা আছে, নীপা জানে।

স্বামীর দোকানের দিকে হাঁটতে থাকে নীপা। কলকাতা শহর চারদিকে, তবু কেবলই মনে হয়, বালিয়াড়ির ভিতরে ডুবে যাচ্ছে না। সামনে জল। জলের শব্দ। কেউ কোথাও নেই, কেবল বাতাস ঝড়ের মতো বহে যায়। মাথার ওপর কালো আকাশ ঝুঁকে আছে।
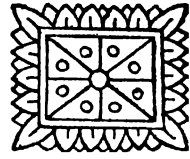
টাপে টোপে প্যাণ্ডেলের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে উঁকি দেয় কুকুরের৷ মুখ। তারা আসছে সতর্ক পায়ে। ক্রমে ক্রমে। বেড়ালেরা আসছে নিঃশব্দে, ভিখিরিরা বাইরের গাছতলায় অনেকক্ষণ বসে আছে একটা ভিখিরির ছেলে ঢুকে গেছে প্যাণ্ডেলে। কুকুর-বেরালের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে পাতার ঠোঙায় কুড়িয়ে নিচ্ছে এঁটো-কাঁটা। মাংসের হাড়, লুচির টুকরো, মাছের কাঁটা জড় করছে এক জায়গায়। খাঁ খাঁ করছে প্যাণ্ডেল। স্টিক লাইট জ্বলছে, ঘুরছে পাখা, এঁটো পাতা উড়ে উড়ে গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। উৎসব-শেষের বীভৎসতা চারদিকে।

বর-বৌ শোওয়ার ঘরে চলে গেল। নিয়ম নয়, কিন্তু আজকাল তো কেউ আর বাসর জাগে না। প্যাণ্ডেলের এক কোণে এখনো যজ্ঞের ছাই পড়ে আছে, দুটো রঙ করা চিত্রিত পিঁড়ি এখনো তোলা হয়নি, দেবদারু পাতায় সাজানো দরজায় মঙ্গল কলস, রঙীন কাগজের শিকল দুলছে হাওয়ায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অমিয় দৃশ্যটা দেখে। সে এরকমভাবে বিয়ে করেনি। কয়েকটা সই করে তারা বিছানায় চলে গিয়েছিল।

পিসেমশাইয়ের হাতে এক হাজার টাকা দেওয়া গেছে অবশেষে। গতকাল সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছে অমিয়। টাকা-টাকা করে। প্যাটারসনের লাহিড়ি শুনে বলল—দূর মশাই, কে-বি ফিট করুন না।

—কে বি কি ?

—কাবলে। আপনার যদি জানাশুনো না থাকে আমি ফিট করে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধানে ট্যাক্‌ল্‌ করবেন। এক হাজার ধার নিলে দু হাজার লিখে দিতে হবে।

—সে কী ?

—ভয় নেই। আসলে ওরা লাইসেন্স-ওলা মানি লেণ্ডার, গভর্ন-মেণ্টের বেঁধে দেওয়া সুদের বেশী আইনতঃ নিতে পার না। আপনাকে লেখাবে ছয় পারসেণ্ট সুদ, নেবে তার দ্বিগুনের বেশী। যদি বাইচান্স আপনি সুদ নিয়ে ঝামেলা করেন, তখন মামলা করবে দু হাজার টাকার ওপর আর যদি সুদ ঠিক মত দিয়ে এক হাজার শোধ দেন তাহলে কাগজ ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু সাবধানে ট্যাকল্ করবেন।

আজ সকালে টাকা পেয়ে গেছে অমিয়। এক হাজার। পিসে-মশাইকে কথামত দেওয়া গেল। রেখার বর ভালই হল। টাটার এঞ্জিনীয়ার। দু হাজার নগদ, গোদরেজের আলমারী, সিঙ্গল খাট দুটো, সোফাসেট, পনেরো ভরি গহনা। পিসেমশাইয়ের বোধহয় আকাশ-বাতাস চাঁদ-সূর্যের আলো ছাড়া আর কিছু রইল না। অমিয়র জন্য সারাদিন হা-পিত্যেশ করে বসে ছিলেন বুড়ো মানুষ। অমিয় এসে টাকাটা হাতে দিতেই উদ্ভাসিত হয়ে গেল মুখখানা। চোখের কোলে জল। বললেন—ভাবলাম তুই বুঝি আর এলিনা! ভয়ে তার অফিসে ফোন করিনি, যদি খারাপ শুনি!

অমিয় একটু হেসেছিল।

হাসি আজ কিছুতেই ট্যাক্সিতে উঠতে চায়নি। বলেছে—এত সুন্দর রাত আজ। বাতাস দিচ্ছে, চাঁদ উঠেছে, বন্ধ গাড়িতে বসে কেন যাব! আমাকে তোমার স্কুটারে নিয়ে চল।

তাই এনেছে অমিয়। তার কোমর ধরে বসে থেকে এল হাসি। মেয়েদের দঙ্গলে মিশে গেছে এখন। উৎসবে হাসিকে চেনা যায় না।

রাস্তায় পার্ক করা শেষ দুটো মার্ক টু গাড়ির একটা ছেড়ে গেল সোনাদাকে নিয়ে। যাওয়ার সময়ে সোনাদা মুখ বাড়িয়ে বলল—অমিয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।

—কী কথা?

—সেই যে, মনে নেই কী বলেছিলি?

—কী সোনাদা?

—তুই বড় পাজী অমিয়, চিরকাল পাজী ছিলি।

—কেন ?

—আমার বয়স হচ্ছে না রে ? এই বয়সে মানুষ একটু গুগিয়ে বসতে চায়, এই বয়সেই তো সংসারের ভোগ সুখ, এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশে।

অমিয় চেঁচিয়ে হেসে বলেছে—ঠিকই তো।

—তবে তুই কেন আমাকে স্টীমারঘাটের কথা বলতে গেলি ?

—কেন, কী হয়েছে ?

—অমিয়, তুই কী বলিস তুই জানিস না! তুই চিরকালের পাজী। জানিস না, ওটা বলতে নেই! অমিয়, তুই চলে আসার পর থেকেই আমার বড় অস্থির লাগে। রাতে ঘুম হয় না। সারা-দিন যখন-তখন অন্যমনস্ক হয়ে যাই। কেবলই মনে পড়ে—স্টীমারঘাট—স্টীমারঘাট।

শেষ মার্ক টু-টা দাঁড়িয়ে আছে। ওটা কার তা জানে না অমিয়। গাড়িটার আড়ালে তার স্কুটার হিম হয়ে আছে। হ্যাণ্ডেলটা একদিকে বাঁকানো। দেখে মনে হয়, ক্লান্ত মানুষ যেমন বসে বসে ঘুমোয় তেমনি ঘুমোচ্ছে।

পরিবেশনের সময়ে এঁটো-কাঁটার গন্ধে গা গুলিয়েছে বলে কিছু খায়নি অমিয়। হাসি কখন আসবে কে জানে! রাত অনেক হয়েছে। পায়ে পায়ে প্যাণ্ডেল ছেড়ে খোলা মাঠে আসে অমিয়। ঠাণ্ডা। দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছে। সেই বাতাসে আকাশজোড়া এক বৃক্ষ নড়ে ওঠে, বকুলের মত খসে পড়ে একটি তারা।

অন্ধকার বারান্দায় দুই বুড়ো বসে আছেন। বরের মামা, আর পিসেমশাই। বরের মামার দুগালে পানের ঢিবি। তিনি পিসে মশাইয়ের দিকে ঝুঁকে বলছেন—পুরুতরা আজকাল বড় শর্টকাট শিখেছে বিয়াই, আধ ঘণ্টায় কুসুমডিঙে সেরে ফেলল! আমার বিয়ের সময়ে চারঘণ্টা লেগেছিল যজ্ঞে। কনে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে

ঢুলতে দেখে আমি চিমটি কেটে জাগিয়ে দিই।

পিসেমশাই মুখ তুলে বলে—তুই কিছু খাসনি অমিয় ?

—না। বমি-বমি করছে।

—খুব খেটেছিস। সোমাকে বলি তোকে একটু সরবৎ করে দিক।

—না, আমি এবার চলে যাই।

—অমিয়, লোকজন খেয়ে কী বলল ? কিছু দোষ ধরেনি তো ?

বরের মামা পিচ ফেলে বললেন—আজকালকার বাজারে যা করেছেন যথেষ্ট।

ঘরে মেয়েদের ভীড়। অমিয় দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে। হাসিকে দেখা যায় না।

সেই ভীড় থেকে সোমাদি এগিয়ে আসে—অমিয়, কী খাবি ?

—কিছু না।

—আমি তো নেমন্তন্নের রান্না খেতে পারি না, তাই এ ঘরে একটু ঝোল-ভাত রেঁধে রেখেছি। খাবি তো আয় ভাগ করে খাই।

—হাসি কোথায় সোমাদি ?

—ওকে তো সব ঘিরে রেখেছে। বলছে, তুমি ফাঁকি দিয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছ, আমাদের খাওয়া মার গেছে। এবার খাওয়াও। অমিয়, হাসি দেখতে কী সুন্দর হয়েছে।

রাত অনেক হয়ে গেল সোমাদি। হাসিকে ডাকো।

—তোর তো স্কুটার আছে, ভুস করে চলে যাবি। রাত হলে ভয় কী ? তোকে একটু দৈ-মিষ্টি এনে দিই ?

—সোমাদি, তুমি এত কষ্ট কর কেন ?

—কিসের কষ্ট ?

—খুব খাটো তুমি' টিফিনের পয়সা বাঁচাও, এত খেটে কী হবে সোমাদি ?

—তোকে তো বলেছি, আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

—সোমাদি, একটা স্টীমারঘাট—

—অমিয়, আমার এখনো অনেক কিছু করা বাকী, টাকা জমাচ্ছি, আমার অনেকদিনের শখ, একটা রেকর্ড-চেঞ্জার কিনব। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের গানের অনেক রেকর্ড। শোন অমিয়, তুই নাকি রেখার বিয়ের জন্য মেসোমশাইকে এক হাজার টাকা দিয়েছিস। সত্যি?

—সোমাদি, তোমাকে সেদিন বলছিলাম—

—কী বলছিলি?

—একটা ফেরীঘাটের কথা—

—অমিয়, মেসোমশাইকে এক হাজার টাকা দিয়ে খুব ভাল করেছিস। আমারও দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কী করে দেব? জানিস তো, গত চৌদ্দ-পনেরো বছর আমার চাকরির ওপরই সংসার চলছে। রেখাকে একটা নেকলেস দিলাম, তাতেই ধার হয়ে গেল। তুই টাকা দিয়ে ভাল করেছিস। মেসোমশাই সবাইকে ডেকে ডেকে তোর দেওয়া টাকার কথা বলছেন।

—সোমাদি—

—শোন অমিয়, এখন আর আমার চাকরি করতে ভাল লাগে না রে। তুই যে সেদিন গিয়ে বললি, ভালবাসার লোক না থাকলে রোজগার করে সুখ নেই, সেটা বাজে কথা নয়। এখন আমি বুঝতে পারি সংসারে আমার যেটুকু আদর তা ঐ চাকরিটার জন্য। ঐ চাকরিটা যদি ছাড়ি তবে দেখব আমি কিছু নই, কেউ নই। আজকাল তাই ভীষণ টায়ার্ড লাগে। বাসায় ফিরে রাত্রে এমন মন-খারাপ লাগে! একটা ইজিচেয়ার কিনেছি, সামনের মাসে কিনব একটা রেকর্ড-চেঞ্জার। বুঝলি অমিয়, বারান্দায় অন্ধকারে বসব, উঠোনে থাকবে অন্ধকার, চুপচাপ বসে চেঞ্জার চালিয়ে দেব—গান হবে—দুঃখের গান—বিরহের গান—শুনতে শুনতে কাঁদব হয়তো—আর মনে পড়বে ··কী মনে পড়বে রে অমিয়···?

অমিয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—তুমি তো জানো সোমাদি…

সোমাদি মাথা নেড়ে চাপা গলায় বলে—জানিই তো, জানব না কেন? মনে পড়বে…

পিসেমশাই সামনে এসে দাঁড়ান। কুঁজো দেখায় তাঁকে, বুড়ো দেখায়। অমিয়র দিকে অপলক একটু তাকিয়ে থেকে বলেন—আমি ভাবতাম ওর পিসিমা মরে গেছে বলেই বোধহয় অমিয় আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, কিন্তু তা নয়। সোমা, অমিয় আমাকে—

—জানি মেসোমশাই। অমিয় বড় ভাল ছেলে।

পিসেমশাই শ্বাস ছেড়ে বলেন—আমি বড় একা হয়ে গেলাম। শেষ মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। সোমা, মাঝে মাঝে আসবি তো? অমিয় তুই?

—আসব না কেন!

কী কথা হচ্ছিল তোদের?

সোমাদি মাথা নীচু করে বলে—কিছু না মেসোমশাই, অমিয় মাঝে মাঝে একটা ফেরীঘাটের কথা বলছে—

ফেরিঘাট! কিসের ফেরিঘাট? কী রে অমিয়?

স্টীমার বাঁধার জেটি, জল…

—ওঃ। পিসেমশাই হাসেন—স্টীমারঘাট মনে পড়তেই খালাসীদের মাংস রান্নার গন্ধ নাকে এসে লাগে এখনো। গোয়ালন্দে পারাপারের সময়ে ঐ গন্ধ যে কী ভাল লাগত! বুঝলি, বাহাদুরাবাদে একবার কাজলি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম—সর্ষেবাটা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল—তেমন আর কখনো কি খাওয়া হবে? এক কাঠা চালের ভাত তুলে ফেলেছিলাম। তুই কোন ফেরিঘাটের কথা বলছিস অমিয়? গোয়ালন্দ? নাকি…

—কী জানি! আমি ঠিক জানি না। খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ি গড়িয়ে নেমে গেছে বহু দূর পর্যন্ত…কালো ছোট্ট একটা জেটি…নির্জন …বালিতে একটা সাপের খোলস পড়ে আছে কেবল…আবছায়ায়

জল দেখা যায়···সে কী জল···অনন্ত, অথৈ এক নদী বয়ে যাচ্ছে···

পিসেমশাই আর একটু কুঁজো হয়ে যান। একটা শ্বাস ফেলে বলেন—এখন এই বাড়িতে আমার একা কাটবে, বাদবাকী যে ক'টা দিন আছি। অমিয়, রাত হল রে, বৌমাকে নিয়ে যাবি, অনেকটা রাস্তা এইবার বেরিয়ে পড়। সোমা, তুই তো আজ যাবি না, না?

—না।

—অমিয়, আর দেরী করিস না। সোমা, বৌমাকে ডেকে দে।

—দিই।

—বড় একা লাগবে, বুঝলি অমিয়? মাঝে মাঝে বৌমাকে নিয়ে চলে আসবি। দু-চারদিন করে থেকে যাবি। মনে করিস, আমি তোর এক বুড়ো ছেলে, আমার তো কেউ রইল না···

অমিয়র স্কুটার ডাকছে। গুড় গুড় গুড় গুড়। পিছনে হাসি। বাতাস সামনে থেকে পিছনে বয়ে যাচ্ছে। তবু মাঝে মাঝে এক এক ঝলক হাসির গন্ধ এসে নাকে লাগে। হাসির গন্ধ! তা তো নয় হাসির আবার গন্ধ কী? ও তো ওর খোঁপার বেলফুলের গন্ধ, সেণ্ট আর প্রসাধনের গন্ধ।

হাসির মুখ দেখতে পাচ্ছে না অমিয়। কেবল তার দু-খানা হাত অমিয়র কোমর বেষ্টন করে আছে। একবার ঝুঁকে নিজের পেটের কাছে হাসির জড়িয়ে থাকা হাতের পাতাদুটি দেখল অমিয়। আঙুলে আংটি ঝলকে ওঠে। মোমে মাজা আঙুলগুলি কী নরম হয়ে লেগে আছে তার পেটে।

হাসি দুরন্ত শ্বাসের সঙ্গে বলে—আরো চালাও না।

—কেন?

—জোরে না চালালে স্কুটারে ওঠার আনন্দ কী!

—হাসি আমার স্কুটারটা পুরনো হয়েছে। স্পীড নেয় না।

—পচা, তোমার স্কুটারটা পচা।

অমিয় হাসে। তিন, সাড়ে তিন বছর আগে ক্যাথিড্রাল রোডে, এই স্কুটারে···

জ্যোৎস্না ফুটেছে কেমন, দেখছ?

—হুঁ।

—ঠিক দুধ-ভাতের মত জ্যোৎস্না, আমার খেতে ইচ্ছে করে।

হাসি তুমি কবে যাচ্ছ?

—তেরই।

—তোমার যদি টাকার দরকার থাকে···

—সামনে ওটা কী, ঐ উঁচু মত?

—গড়িয়াহাটা ব্রীজ।

—ওমা! ওর ওপর দিয়ে তো রোজ যাই আসি, কৈ অত উঁচু বলে তো মনে হয় না, ঠিক টীলার মত দেখাচ্ছে দেখ। চা-বাগানে আমরা ছেলেবেলায় টিলা থেকে ছুটে নামতাম—একবার দৌড় শুরু করলে আর থামা যায় না, কেবলই গতি বেড়ে যায়।

—হুঁ।

তোমার স্কুটারটা পচা। আর একটু জোরে চালাও না।

—কেন?

—আমার স্পীড ভাল লাগে।

গুড় গুড় করে স্কুটার ডাকে। গড়িয়াহাটা ব্রীজের গোড়া থেকে চড়াই ভাঙে। অমিয় স্পষ্টই টের পায় তার বয়স্ক স্কুটারটার এই চড়াই ভাঙতে কষ্ট হচ্ছে। 'খুব বেশীদূর নয় আর', সে মনে মনে তার স্কুটারেকে বলে, 'আর একটু কষ্ট করো স্কুটার। তারপর অন্ধকার সিড়ির নীচে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোবে।'

—ব্রীজের ওপর ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়াবে?

—হাসি, অনেক রাত হয়েছে।

—ক'টা বাজে?

—বারোটা চল্লিশ।

—হোকগে। তুমি দাঁড়াও।

ব্রীজের ঠিক ওপরটায় বাতাসের জোর বেশী। আকাশের কাছাকাছি উঠে তারা দাঁড়ায়। হাসি রেলিংয়ের কাছে চলে যায় ডেকে বলে—দেখ, কত দুর পর্যন্ত কী ভীষণ জ্যোৎস্না। সব দেখা যাচ্ছে। এত রাতে কলকাতা কখনো দেখি নি।

অমিয় বাতাসে সিগারেট ধরাতে পারছিল না। বার বার দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যাচ্ছে। সে স্কুটারের ওপর না-ধরানো সিগারেট মুখে নিয়ে বসে রইল। হাসি তাকে ডাকে না। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে হাসি একা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত অনন্ত শহরটি দেখে মুগ্ধচোখে। এখন যদি নিঃশব্দে অমিয় তার স্কুটারকে ব্রীজের ঢালুর ওপর দিয়ে গড়িয়ে দেয়, যদি চলে যায়, তাহলে হাসি অনেকক্ষণ টেরই পাবে না যে অমিয় চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে স্কুটার এবং অমিয়কে না দেখে একটুও অবাক হবে না হাসি। তার মনেও পড়বে না যে, এই ব্রীজের ওপর সে অমিয়র সঙ্গে এসেছিল, তার স্কুটারে। হাসির মনেই পড়বে না।

না-ধরানো সিগারেট মুখে অমিয় অপেক্ষা করে। বাতাসে আকাশজোড়া এক বৃক্ষ নড়ে। বকুলের মত খসে পড়ে তারা। অমিয় অপেক্ষা করে।

একদিন যায়। দুদিন যায়।

দীর্ঘ টেণ্ডার টাইপ করতে করতে অমিয়র কাঁধ ব্যথা করে। চোখে ঝাপসা দেখে। সিগারেটে সিগারেটে জিভ বিস্বাদ। রাজেন চা এনে রেখে গেছে। খাওয়া হয় নি।

—বাগচী। কল্যাণ ডাকে।

—উঁ?

—আপনার কি কিছু টাকার দরকার?

অমিয় হাসে।

—রাজেনের কাছে আমি আরো ছ'শো টাকা রেখে দিয়েছি। আমি থাকি বা না থাকি, যখন দরকার হয় নেবেন।

—অনেক ধার হয়ে গেল মুখার্জী।

—আপনার সময়টা ভাল যাচ্ছে না। সেনগুপ্তের কোন পাত্তা পেলেন?

—না।

—কত টাকার বিল পেমেণ্ট নিয়ে গেছে?

—প্রায় সাত হাজার।

—ওকে খুঁজে পেলে কী করবেন?

—কিছুই না। কেবল একটা কথা বলব—

—কী কথা?

—বলব...

অমিয় আর বলে না। বলতে পারে না। টাইপরাইটারে ওপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখ। চোখে মেঘ বাষ্পরাশি জমে ওঠে। সে দেখে, টাইপ করা লাইনের অক্ষরগুলো কে যেন আঙুলের টানে লেপে দিয়ে গেছে। কালো রেখার মত দেখায়। লাইনগুলো ধীরে আঁকাবাঁকা হয়ে যেতে থাকে। দুলতে থাকে। অমিয় দেখতে পায়, লাইনগুলো দুলতে দুলতে ঢেউ হয়ে যাচ্ছে।...ঢেউ আর ঢেউ। ফুলে উঠছে জল—অনন্ত অথৈ মহাসমুদ্রের মত জল। কালো মহা আকাশ ঝুঁকে আছে তার ওপর। বালিয়াড়ি ধূ ধূ করে সাদা হাড়ের মত। গড়ানে বালি, বালির ওপর ঢেউয়ের দাগ। সাপের খোলস উল্টে পড়ে আছে।

—মুখার্জী, আমি আপনাকে একটা জিনিস প্রেজেণ্ট করব।

—কী?

—আমার স্কুটারটা।

—তা কেন বাগচী! এখন আপনার সময় ভাল যাচ্ছে না। প্রেজেণ্ট সুসময়ে করবেন।

—এই ঠিক সময় মুখার্জী। স্কুটারটার আর আমার দরকার নেই।

কল্যাণ একটু চুপ করে থাকে—যদি দরকার না থাকে তো ওটা আমি কিনে নিতে পারি।

—না মুখার্জী, আমাদের বংশে কেউ কখনো ঘরের জিনিস বেচেনি। আমি ওটা আপনাকে দিয়ে দেব। অভাবের সময়েই দেওয়া ভাল, সুসময়ে দেওয়া হয় না।

কল্যাণ চুপ করে থাকে।

—রাজেনের কাছে টাকাটা আছে বাগচী দরকার হলে নেবেন।

—আচ্ছা।

টেণ্ডার সীল করে অমিয় বেরোয়। মেঘ কেটে রোদ উঠছে চারদিকে পাথুরে শহর। প্রতিদ্বন্দ্বী কলকাতা। নীচে স্কুটারটা দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় চেয়ে থাকে। তারপর স্কুটার ছাড়ে।

—লাহিড়ী।

—উঁ।

—টেণ্ডার দিয়ে গেলাম।

—আচ্ছা। দেখব।

—লাহিড়ী, প্যাটারসন কি এখনো আমাকে বিশ্বাস করে?

লাহিড়ী হাসে। বলে—ওসব রোমান্টিক কথা ছাড়ুন। কে কাকে বিশ্বাস করে! অর্ডার আপনি পাবেন। ঠিকমত রেট দিয়েছেন তো, যেমন বলেছিলাম?

—দিয়েছি।

—ঠিক আছে।

অমিয় বেরোয়। ঘুরতে থাকে। মাঝে মাঝে নিজের অফিস ছুঁয়ে যায়।

বাগচী

—উঁ?

—ল্যাংগুয়েজ নিয়েই সবচেয়ে মুশকিল।

অমিয় হাসে। বলে—কেন?

রজত হাই তুলে বলে—কিছুতেই ল্যাংগুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ মেয়েটা রোজই মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ভারী অস্বস্তি।

—চেয়ে থাকে কেন?

—বোধহয় এক্সপেক্ট করে, জার্মানী যাওয়ার আগে আমি তাকে ফাইনাল কিছু বলে যাব। বাঙালী মেয়েদের জীবন খুব অনিশ্চিত তো। অথচ আমি কিছু বলতে পারছি না। ল্যাংগুয়েজ নিয়েই মুশকিল।

—কবে যাচ্ছেন?

—হরি সিং-এর সঙ্গে কণ্ট্যাক্ট করেছি। দিন কুড়ির মধ্যেই চলে যাব।

—আমাদের একা লাগবে।

—জানি। আফটার অল উই্ আর ওয়্যার ফম.রডস্। বাগচী, আপনার জন্য কী পাঠাব বললেন না?

—ভেবে দেখি।

—সেনগুপ্তকে যদি কখনো খুঁজে পান বাগচী, গিভ হিম অ্যান এক্সট্রা কিক্ ফর মি। মনে রাখবেন।

অমিয় হাসে।

মিশ্রিলাল এসে চুপ করে বসে থাকে, ধৈর্য ধরে।

—বাগচীবাবু।

—জানি মিশ্রিলাল।

—আপনি তো আর কোন অর্ডার পেলেন না! বিজনেসের কী হবে? আমি ডুবে যাবো না তো!

বোধহয় দূরে কোথাও মেঘ-গর্জনের মত একটা শব্দ হয়। অমিয় কান পেতে শোনে। শার্শির বাইরে আজ প্রবল রোদ। কোথাও মেঘনেই। .ব শব্দটা কেথা থেকে শানে অমিয়? একবার চোখ

বোজে সে। অমনি এক পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত-বিদ্যুৎ সিংহ তার চোখে ছায়া ফেলে দাঁড়ায়। গভীর অরণ্যের ছায়ায় বহু দূরের সিংহ এক ডাকে—মেঘ-মাটি কেঁপে ওঠে।

সে বলে—ডুববে না মিশ্রিলাল। আমি আছি। থাকব।

হাসির সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না আজকাল। রাত পর্যন্ত সে বাইরে থাকে। ফিরে এসে দেখে, হাসির ঘর ফাঁকা। বোধহয় হাসি কলকাতায় তার চেনাশোনা মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, দেখে সিনেমা-থিয়েটার, বোধহয় তার নেমন্তন্ন থাকে খাওয়ার। কে জানে! মধু তাকে চা করে দেয়। জিজ্ঞেস করে—বাবু, আপনার গাড়ি!

—দিয়ে দিয়েছি একজনকে।

বুড়ো মধু বিড় বিড় করে কী যেন বলে। বোধহয় জীবনের অনিত্যতার কথা নিজেকে শোনায়।

রাত বেড়ে যায়। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে। ঘুম হয় না। উঠে বসে অমিয় আলো জ্বালে। অফিসের কাগজপত্র দেখে। টেণ্ডারের খসড়া তৈরী করে। সে সময়ে ভেজানো দরজা ঠেলে হাসি আসে। নিঃশব্দে ঘরে চলে যায়। কাপড় ছেড়ে কলঘরে ঢোকে। বেরিয়ে আসে জল খায়। শুয়ে পড়ে।

তাদের মধ্যে কোন কথা হয় না। হাসির যাওয়ার দিন এসে গেল।

রোদের তাপ আজকাল খুব বেড়ে গেছে। অমিয়র তাই কষ্ট হয় খুব। অনেকটা হাঁটতে হয়। কল্যাণ প্রায়ই বলে—বাগচী, স্কুটারটা নিয়ে বেরবেন।

অমিয় হাসে। নেয় না। কল্যাণ কয়েকদিনে ভালই শিখে গেছে চালাতে। ও যখন স্কুটার চালায় তখন মুগ্ধ হয়ে দেখে অমিয়। ভাল লাগে। হিংসে হয় না।

রজতের কোন কাজ নেই আজকাল। ব্যবসা সীল করে দিয়েছে। তবু রোজ এসে দেখা করে যায়।

—কবে ফ্লাই করছেন সেন ?

—বলিনি আপনাকে ? বিশ তারিখ, টিকিট পেয়ে গেছি।

—বাঃ! ভাল খবর।

—বাগচী, ইউ আর সাফারিং টু মাচ্।

ধারগুলো শোধ করতে হবে সেন।

—পালিয়ে যান না। সেনগুপ্তকে কে আর ধরতে পেরেছে।

অমিয় চমকে ওঠে। পালাব! পালাব কোথায়! স্টীমারঘাটে ঠিক দেখা হবে একদিন···তখন ? অমিয় হাসে।

—বাগচী যদি সত্যিই কেটে পড়তে চান তো ব্যবস্থা করতে পারি।

—কী রকম ব্যবস্থা ?

জব্ ভাউচার। তিন মাসের মধ্যে আপনাকে নিয়ে যাব।

অমিয় হাসে।

কখনো কখনো শূন্য ঘরে, তার টেবিলের ওপর বিশাল সিংহ এক লাফ দিয়ে উঠে আসে। ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে তার শরীর, পিঞ্জরসার দেহ, পিঙ্গল কেশর। মুখে বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার। পুরুষের এ রকমই হওয়ার কথা ছিল। কে তাকে শেখাল নারী-প্রেম, হাঁটু গেড়ে প্রণয়ভিক্ষা, মোলায়েম ভালবাসার কথা! অপরূপ মগ্ন হয়ে দেখে অমিয়।

তারপর টাইপরাইটার যন্ত্রটা টেনে নিয়ে বসে।
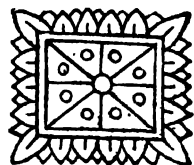
—আপনি বার বার কেন একটা স্টীমারঘাটের কথা বলেন জামাইবাবু ?

আমি বলি না। অমিয় বলে। তুমি ওর কাছ থেকে কখনো শুনে নিও।

—কী করে শুনব ! আমি কাল চলে যাচ্ছি।

—শুনলে ভাল করতে।

—কেন ?

জামাইবাবু টেলিফোনের অন্যপ্রান্তে শ্বাস ফেলে।

—হাসি, আমাদের বয়স হয়ে গেল।

—হঠাৎ একথা কেন ?

—কী জানি ! আজকাল হঠাৎ কাজকর্মের মাঝখানে বয়সের কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে···

—কী ?

—স্টীমারঘাট·· তুমি সাবধানে যেও হাসী। গঙ্গার ওপর ব্রীজটা যে কবে ওরা শেষ করবে !

—আমি পাগল হয়ে যাব জামাইবাবু, স্টীমারঘাটের কথাটা আগে বলুন।

কোন স্টীমারঘাট ?

ফারাক্কা।

—না, ফারাক্কার কথা আপনি বলছেন না।

জামাইবাবু চুপ করে থাকে।

—বলবেন না ?

—তুমি অমিয়র কাছে শুনো।

—ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে কখন? ও অনেক রাতে ফেরে, খুব সকালে বেরিয়ে যায়।

—কাল স্টেশনে অমিয় যাবে না?

—বলেছিল তো যাবে। অফিসে কাজ আছে, সেখান থেকেই সম্ভব হলে স্টেশনে যাবে।

—তবে আর সময় হবে না।

—কীসের?

—স্টীমারঘাটের কথা শোনার। ফোন রেখে দিচ্ছি হাসি…

হাসি রিসিভার রেখে দেয়।

পরমুহূর্তেই আবার তুলে দ্রুত ডায়াল করে।

—হ্যালো আমি অমিয় বাগচীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। এক্ষুনি জরুরী দরকার।

একটু অপেক্ষা করতে হয়। তারপর অমিয়র গলা ভেসে আসে—বাগচী বলছি।

—শোন, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

—কী কথা?

—তুমি আমাকে একটা কথা কোনদিন বল নি।

—কী?

—স্টীমারঘাটের কথা। সবাইকে বলেছ, আমায় ছাড়া। একবার আমাকে বলবে?

—আমার সময় নেই হাসি।

—কেন?

—আমি খুব ব্যস্ত।

—কেন ব্যস্ত?

—অনেক কাজ হাসি। আমাদের সময় তো বেশী নয়।

—বলবে না?

—সময় বড় কম হাসি।

—স্টীমারঘাটের অর্থ কী?

—কী করে বলব। আমিই কি জানি?

—কী আছে সেখানে?

—কিছু নেই। শুধু একটা উঁচু, বালিয়াড়ি, ধূ ধূ বালি গড়িয়ে নেমে গেছে, একটা সাপের খোলস উল্টে পড়ে আছে। বালির শেষে দূর থেকে একটা কালো জেঠি দেখা যায়। তারপর জল। সে খুব অথৈ জল, অনন্ত জল, প্রকাণ্ড এক নদী, তার ওপর কালো আকাশ ঝুঁকে আছে…

হাসি স্তব্ধ হয়ে থাকে।

—এর মানে কী?

—আমি জানি না। তবে মনে হয়, ওখানে একদিন সকলের দেখা হবে।

—কেন?

—…

—কেন?

—…

—কেন?

—…

—কেন?
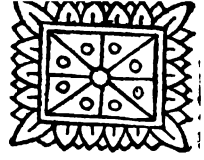
প্যাটারসনের অর্ডারটা আজ বেরিয়েছে।

সকাল থেকেই অমিয় ঘুরছে বাজারে। ভাদ্র মাস পড়ে গেল প্রায়। রোদের তাপ অসম্ভব। মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড় ওঠে। ঘূর্ণী হাওয়ার মত হাওয়া দেয়। হাঁটতে খুবই কষ্ট হয় অমিয়র। তবু সে হাঁটে। মাঝে মাঝে স্পষ্ট দেখতে পায় সামনে, ভীড় ভেদ করে চলেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ। পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহটিতে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ-গায়ে বৈরাগ্যের ধূসর রঙ, চোখে দূরের প্রসার। সিংহ মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে নেয়। দেখে নেয়, অমিয় ঠিকঠাক চলছে কিনা।

অমিয় চলে। সাপ্লায়ারদের কাছে ঘোরে। দোকান যাচাই করে। সে আছে থাকবে।

স্টীমারঘাটের ছায়াটা চকিতে ভেসে ওঠে চোখে। মিলিয়ে যায়। দেখা হবে, একদিন সকলের সাথে দেখা হবে।

দুপুরের দিকে অফিসে ফিরে একটা সিগারেট মুখে টাইপরাইটারের সামনে বসে অমিয়। টাইপ করতে থাকে।

কল্যাণ ঘরে ঢুকেই বলে-এ কী বাগচী?

—কী?

—আপনি এখনো যাননি?

—কোথায়?

—কাল যে বলছিলেন আজ দার্জিলিং মেলে আপনার স্ত্রী চলে যাচ্ছেন!

—ওঃ।

—ভুলে গিয়েছিলেন?

অমিয় লজ্জিত হয়ে হাসে। সে ভুলে গিয়েছিল। হাসির কথা তার মনেই ছিল না।

—ক'টা বাজে মুখার্জী ?

—বারোটা চল্লিশ। পঞ্চাশে ট্রেন ছেড়ে যাবে।

—তাহলে আর গিয়ে কী হবে!

—উঠুন তো। নীচে স্কুটার রয়েছে···তাড়াতাড়ি করুন, হার্ড লাক —পেতে পারেন। উঠুন, উঠুন···

দেরিই হয়ে গেল অমিয়র

স্কুটার থেকে নেমে সে দ্রুত পায়ে উঠে এল স্টেশনের হলঘরে। আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষ—যারা প্রিয়জনদের বিদায় জানাতে এসেছিল। কোলাপ্‌সিব্‌ল গেটের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অমিয় শূন্য রেল লাইনটা দেখে। বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়, লাইনটা চকচক করছে। কয়েকজন লোক বেরিয়ে আসছিল। তারা সরে যেতেই অমিয় দেখতে পেল হাসি দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে সুটকেস। সে একা।

—কী হল ?

হাসির মুখ চিন্তান্বিত। কপালে ভ্রূকুটি। কেমন যেন আস্তে, আস্তে, চিন্তা করে করে বলল আমি ট্রেনটা ধরতে পারিনি।

—কেন ?

—পারলাম না।

—কেন ?

হাসি খুব বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বলে—কী জানি! আমাকে কখনো জিজ্ঞেস কোর না।

অমিয় একটু হাসে।

আজকাল অমিয় যখন সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ঘুমোয় তখন তার স্বপ্নের মধ্যে উপযুপরি সিংহের ডাক শোনা যায়।

মেঘ-গর্জনের মত সেই ডাক। মাটিতে লেজ আছাড়ানোর শব্দ

হয়   পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, গায়ের ধূসর রঙে বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার—সিংহেরা তার ভিতরে ঘুরে বেড়ায়। উপর্যুপরি ডাক দেয়, মেঘ-মাটি কেঁপে ওঠে। ঘুমের মধ্যে অমিয় হাসে।

অন্য ঘরে হাসির তেমন ঘুম হয় না। বহুদূর থেকে এক অচেনা রহস্যময় স্টীমারঘাটে এগিয়ে আসে। সে দেখে ধূ ধূ বালিয়াড়িতে চাঁদের আলো পড়েছে। পড়ে আছে সাপের খোলশ। উঁচু থেকে দেখা যায়—গড়ানো বালিয়াড়ির শেষে জেটি, তারপর অনন্ত নিঃশব্দ জলরাশি—অথৈ। সেই স্রোতের ওপর আবহমান কাল ধরে ঝুঁকে আছে এক কালো আকাশ। ঐখানে সকলের দেখা হবে। কেন না, তারা বিশ্বস্ত থাকে নি নিজের প্রতি, এই দুর্লভ পার্থিব জীবন নিয়ে তারা হেলাফেলা করেছিল।

এসব সে নিজেই ভাবে। ভাবতে ভাবতে ভাবনা পাল্টেফেলে। বারংবার সে ঐ স্টীমারঘাটের অর্থ খুঁজতে থাকে। খুঁজে পায় না। কিন্তু না-বুঝেও সে মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে অপলক চেয়ে থাকে। জলে চোখ আপনি ভেসে যায়।

॥ শেষ ॥